প্রবন্ধ

বিজ্ঞান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

BENGALIEBOOK.COM
2021

সূচিপত্র

- সামুদ্রিক জীব 2
- গতি নির্ণয়ের ইন্দ্রিয় 28
- ইচ্ছামৃত্যু 29
- মাকড়সা- সমাজে স্ত্রীজাতির গৌরব 31
- উটপক্ষীর লাথি 32
- জীবনের শক্তি 33
- ভূতের গল্পের প্রামাণিকতা 35
- মানব শরীর 37
- রোগশত্রু ও দেহরক্ষক সৈন্য 39
- উদয়াস্তের চন্দ্রসূর্য 43
- অভ্যাসজনিত পরিবর্তন 46
- ওলাউঠার বিস্তার 49
- ঈথর 52
- ভূগর্ভস্থ জল এবং বায়ুপ্রবাহ 54

সামুদ্রিক জীব

প্রথম প্রস্তাব

কীটাণু

এই সমুদ্র, এই জলময় মহা মরুপ্রদেশ, যাহা মনুষ্যদিগের মৃত্যুর আবাস, যাহা শত শত জলমগ্ন অসহায় জলযাত্রীর সমাধিস্থান, তাহাই আবার কত অসংখ্য জীবের জন্মভূমি, ক্রীড়াস্থল! স্থল-প্রদেশ এই জলজগতের তুলনায় কত সামান্য, কত ক্ষুদ্র। মিশ্লে (Michelet) কহেন, পৃথিবীতে জলই নিয়ম-স্বরূপ, শুষ্ক ভূমি তাহার ব্যতিক্রম মাত্র। পৃথিবীর এই চতুর্দিকব্যাপি, এই কুমেরু হইতে সুমেরু পর্যন্ত বিস্তৃত মহাপরিখা যদি শুষ্ক হইয়া যায়, তবে কী মহান, কী গম্ভীর দৃশ্য আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হয়, কত পর্বত, কত উপত্যকা, সামুদ্রিক-উদ্ভিদ-শোভিত কত কানন কত ক্ষুদ্র ও প্রকাণ্ড জীব আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। এই সামুদ্রিক অরণ্যে কত প্রাণী ছুটিতেছে, সাঁতার দিতেছে, বালির মধ্যে লুকাইতেছে, কেহ বা বিশাল পর্বতের গাত্রে লগ্ন হইয়া আছে, কেহ বা গহ্বরে আবাস নির্মাণ করিতেছে, কোথাও বা পরস্পরের মধ্যে মহা বিবাদ বাধিয়া গিয়াছে, কোথাও পরস্পর মিলিয়া স্নেহের খেলায় রত রহিয়াছে। আমাদের প্রসিদ্ধ কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী মহাশয় সমুদ্র-বর্ণনাস্থলে যে একটি লোমহর্ষণ চিত্র দিয়াছেন তাহা এই স্থলে উদ্‌ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

৪১

“যতই তোমার ভাব, ভাবি হে অন্তরে,
ততই বিস্ময়-রসে হই নিমগন;
এমন প্রকাণ্ড কাণ্ড যাহার উপরে,

না জানি কী কাণ্ড আছে ভিতরে গোপন।

৪২

আজি যদি আসি সেই মুনি মহাবল,
সহসা সকল জল শোষেন চুম্বুকে;
কী এক অসীমতর গভীর অতল,
আচম্বিতে দেখা দেয় আমার সমুখে!

৪৩

কী ঘোর গর্জিয়া উঠে প্রাণী লাখে লাখে,
কী বিষম ছটফট ধড়ফড় করে;
হঠাৎ পৃথিবী যেন ফাটিয়া দোফাক,
সমুদয় জীবজন্তু পড়েছে ভিতরে।

৪৪

কোলাহলে পুরে গেছে অখিল সংসার,
জীবলোক দেবলোক চকিত স্থগিত;
আর্তনাদে হাহাকারে আকাশ বিদার
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন বেগে বিলোড়িত।

৪৫

আমি যেন কোন্ এক অপূর্ব পর্বতে
উঠিয়া দাঁড়ায়ে আছি সর্বোচ্চ চূড়ায়;

বালুময় ঢালুভাগ পদমূল হতে
ক্রমাগত নেমে গিয়ে মিশেছে তলায়।

৪৬

ধুধু করে উপত্যকা, অতল অপার,
অসংখ্য দানব যেন তাহার ভিতরে,
করিতেছে হুড়াহুড়ি- তুমুল ব্যাপার,
মরীয়া হইয়া যেন মেতেছে সমরে।

৪৭

ফেরো গো ও পথ থেকে কল্পনা সুন্দরী
ওই দেখো যাদকুল নিতান্ত আকুল,
নিতান্তই মারা যায় মরুর উপরি,
হেরে কি অন্তর তব হয় নি ব্যাকুল?

৪৮

সেই মহা জলরাশি আনো ত্বরা ক'রে,
ঢেকে দাও এই মহা মরুর আকার,
অমৃত বর্ষিয়া যাক ওদের উপরে;
শান্তিতে শীতল হোক সকল সংসার।'

ক্ষুদ্রতম অদৃশ্য কীটাণু হইতে বৃহৎ তিমি মৎস্য পর্যন্ত এবং আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ হইতে সহস্র হস্ত দীর্ঘ অ্যাল্‌জি (Algae) নামক উদ্ভিদ পর্যন্ত এই সমুদ্রের গর্ভে প্রতিপালিত হইতেছে। এই সমুদ্রগর্ভে যত প্রাণী আছে, স্থল-প্রদেশে তত প্রাণী নাই!

সমুদ্রে এক প্রকার অতি নিকৃষ্টতম শ্রেণীর প্রাণী দেখিতে পাইবে। তাহারা উদ্ভিজ্জ শ্রেণী হইতে এক সোপান মাত্র উন্নত। তাহাদের শারীরযন্ত্র এত সামান্য যে, সহসা তাহাদের প্রাণী বলিয়া বোধ হয় না। ইহারাই পৃথিবীর প্রাণীসৃষ্টির মধ্যে আদিম সৃষ্টি বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। পৃথিবী যত প্রাচীন হইতে লাগিল, ততই জটিল শরীর-প্রকৃতি-বিশিষ্ট জীবের উৎপত্তি হইল, অবশেষে তাহার উৎকর্ষের সীমা মনুষ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ মনে করেন, এইখানেই আসিয়া শেষ হইল, আর অধিক অগ্রসর হইবে না, কিন্তু কে বলিতে পারে, এই মনুষ্যালয়ের উপর আর-এক স্তর মৃত্তিকা পড়িয়া যাইবে না, ও এই মনুষ্য-সমাজের সমাধির উপর আর-একটি উন্নততর জীবের উৎপত্তি হইবে না। পৃথিবীর প্রথম অবস্থায় উদ্ভিদ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, তাহার মধ্যে প্রথমে আবার নিকৃষ্টতম উদ্ভিদের জন্ম হয়।

যদি কিয়ৎপরিমাণে জল খোলা জায়গায় কোনো পাত্রে রাখিয়া দেওয়া হয়, তবে শীঘ্রই দেখা যায়, তাহার উপর পীত ও হরিৎবর্ণের অতি সূক্ষ্ম আবরণ পড়িয়াছে, অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিতে গেলে দেখা যাইবে, সেগুলি আর কিছুই নহে, সহস্র সহস্র উদ্ভিদ-পদার্থ ভাসিতেছে। তাহার পরেই সহস্র কীটাণু দেখা যাইবে, তাহারা দলবদ্ধ হইয়া সাঁতার দিতেছে ও সেই উদ্ভিজ্জ আহার করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছে। এই উদ্ভিদ-পদার্থ যাহা আমরা অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত দেখিতে পাই না, তাহাই হয়তো তাহাদের নিকটে একটি বৃহৎ রাজ্য। পরে আর-এক দল কীটাণু উত্থিত হইয়া প্রথমজাত কীটাণুদিগকে আক্রমণ করে, ও উদরসাৎ করিয়া ফেলে। প্রথমে উদ্ভিদ, পরে উদ্ভিদভোজী জীব, তৎপরে মাংসাশী প্রাণী উৎপন্ন হয়।

কোন্‌খানে উদ্ভিদ-শ্রেণী শেষ হইল ও জীব-শ্রেণীর আরম্ভ হইল, তাহা ঠিক নিরূপণ করা অতিশয় কঠিন। দেখা গিয়াছে যে, শৈবালের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে, অ্যাল্‌জি জাতীয় উদ্ভিদে, প্রাণী-জীবনের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ বর্তমান আছে; মনে হয় যেন তাহাদের চলনেন্দ্রিয় আছে। তাহাদের গাত্রে চলনশীল যে সূক্ষ্ম সূত্র লম্বমান থাকে, তাহার দ্বারা

তাহারা ইতস্তত চলিয়া বেড়ায়, তাহা দেখিয়া সর্বতোভাবে মনে হয় যেন তাহারা ইচ্ছাপূর্বক চলিয়া বেড়াইতেছে। কতকগুলি উদ্ভিদের অঙ্কুর এবং উদ্ভিদের উৎপাদনী আণবিক রেণুকণা (Fecundating corpuscles) জলে ভাসিবার সময় নিকৃষ্ট প্রাণীদিগের ন্যায় ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে, আবার পুনরায় ফিরিয়া আসে ও পুনরায় সেদিকে ধাবমান হয়। এইরূপে আপাতত প্রতীয়মান হয়, যেন তাহাদের চেষ্টা করিবার ক্ষমতা আছে। ইহাদের সহিত যদি সামুদ্রিক কতকগুলি নিকৃষ্ট জাতীয় জীবের তুলনা করা হয়, তবে কাহারা উদ্ভিদ ও কাহারা প্রাণী তাহা স্থির করা দুষ্কর হইয়া পড়ে।

পূর্বোক্ত নিকৃষ্ট জাতীয় জীবদিগকে য়ুরোপীয় ভাষায় জুফাইট (Zoophyte) অর্থাৎ উদ্ভিদজীব বা উদ্ভিদ-প্রাণী কহে। কারণ ইহাদের মধ্যে অনেকের বাহ্য আকৃতি উদ্ভিদের ন্যায়, তাহাদের শরীর হইতে উদ্ভিদের ন্যায় শাখা বহির্গত হয়। এবং তাহাদের কোনো কোনো অঙ্গ নানা বর্ণে চিত্রিত এবং দেখিতে পুষ্পের ন্যায়। প্রবালদিগকে দেখিতে অবিকল উদ্ভিদের ন্যায়, মৃত্তিকায় বা পর্বতে তাহাদের মূল-দেশ নিহিত থাকে, এবং গাত্র হইতে শাখা-প্রশাখা বহির্গত হয়, এবং তাহাদের রঙিল অঙ্গগুলি কাল-বিশেষে অবিকল পুষ্পের ন্যায় আকার ধারণ করে। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা এই প্রবালকে নিঃসংশয়ে উদ্ভিদ বলিয়া গণ্য করিয়া গিয়াছেন, সম্প্রতি ইহা প্রাণী বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

এই নিকৃষ্টতম প্রাণীদিগের কি বুদ্ধি বা মনোবৃত্তি আছে? ইহা স্থির করা এক প্রকার অসম্ভব। প্রথমত ইহারা প্রাণী কি উদ্ভিদ, তাহাই কত কষ্টে স্থিরীকৃত হইয়াছে, এক্ষণে ইহাদের বুদ্ধি বা মনোবৃত্তি আছে কি না তাহা স্থির করিতে বোধহয় অনেক বিলম্ব লাগিবে। শুক্তিরা তো জন্মাবধি এক শৈলেই আবদ্ধ থাকে। কীটাণুরাও একটিমাত্র ক্ষুদ্রতম স্থান ব্যাপিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। অ্যামিবি কীটগণ, মিনিটের মধ্যে যাহারা শত বার আকার পরিবর্তন করে, তাহারা তো জীবন্ত পরমাণু মাত্র। ইহাদের বুদ্ধি ও মনোবৃত্তি আছে কি না তাহা স্থির করা যে দুরূহ, তাহা বলা বাহুল্য।

উদ্ভিদজীবদিগের কঙ্কাল অতিশয় অপূর্ণ, স্নায়ুযন্ত্র অত্যন্ত অপরিস্ফুট। এই জাতীয় অধিকাংশ জীবের স্পর্শ ভিন্ন অন্য প্রকার অনুভূতি নাই, ইহারাই প্রাণী-জগতের শেষ শ্রেণীর নিকৃষ্টতম জাতির অন্তর্ভূত। উদ্ভিদজীবেরা অনেক জাতিতে বিভক্ত।

লয়বেনহয়েক (Leuwenhoek) যখন অণুবীক্ষণ লইয়া সমুদ্রের এক বিন্দু জল পরীক্ষা করিতে গেলেন, তখন দেখিলেন, সেই এক বিন্দু জলের মধ্যে একটি নূতন জগৎ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সেই নূতন রাজ্যের অধিবাসীদিগের সংক্ষেপ বিবরণ পাঠ করা যাক।

রিজোপডা (Rizopoda) বা শীকড়-পদ কীটগণের বিশেষ প্রকৃতির মধ্যে, উহাদের পাকযন্ত্র নাই, জলজ উদ্ভিদগণের ন্যায় উহাদের গাত্রে যে সূক্ষ্ম সূত্র থাকে তাহা দ্বারা চলা-ফিরা করে, নিজ শরীর ইচ্ছাক্রমে বর্ধিত ও শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত করিতে পারে। সময়ে সময়ে দেখা যায়, শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত অঙ্গগুলি ক্রমে ক্রমে গুটাইয়া আসে ও ক্রমে তাহাদের শরীরের মধ্যে মিলাইয়া যায়। মনে হয় যেন আপনার শরীর আপনিই ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। এই জাতীয় কীটেরা আবার অন্যান্য কীট এবং অন্যান্য জন্তুদিগের গাত্রে লগ্ন হইয়া প্রাণ ধারণ করে। অনেক জাতীয় রিজোপডা আছে, তন্মধ্যে দুই-তিনটির বিবরণ প্রকাশ করা যাইতেছে।

অ্যামিবি (Amibae) নামক কীটাণুদিগের আঠাবৎ শরীর এমন স্বচ্ছ, এত ক্ষুদ্র যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রে রাখিয়া সময়ে সময়ে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহাদের শরীরের গঠন যে কী প্রকার তাহা কিছুই ভাবিয়া পাওয়া যায় না। অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিতে ইহারা এক বিন্দু জলের ন্যায়, কিন্তু মুহূর্তে মুহূর্তে ইহারা এত বিভিন্ন আকার ধারণ করে যে, ইহাদের আকৃতি কোনোমতে নির্ধারিত করা যায় না। ইহাদের শরীরে পাকযন্ত্র দেখা যায় না, তবে ইহারা কী করিয়া জীবন ধারণ করে? এইরূপ স্থির হইয়াছে যে, খাদ্যদ্রব্য তাহারা শরীরের সহিত মিশাইয়া লয়। অণুবীক্ষণ দিয়া ইহাদের শরীরে মাঝে মাঝে উদ্ভিদের অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা যেরূপ ইচ্ছামতে শরীর প্রসারিত ও কুঞ্চিত করিতে পারে, তাহাতে

শরীরের সহিত খাদ্য মিশ্রিত করিবার ইহাদের অনেকটা সুবিধা আছে। কোনো একটি উদ্ভিদাণুর উপরে নিজ শরীর প্রসারিত করিয়া পুনরায় কুঞ্চিত করিলে সহজেই তাহা তাহাদের শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যায়।

ফরামিনিফেরা (Foraminifera) নামক পূর্বোক্ত জাতীয় আর-এক প্রকার কীট আছে, তাহারা প্রায় চক্ষুর অদৃশ্য বলিলেও হয়, তাহাদের আয়তন এক ইঞ্চির দুই শতাংশ অপেক্ষা অধিক নহে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র কীটগণের দ্বারা কত বৃহৎ ব্যাপার সম্পাদিত হইয়াছে, ভাবিয়া দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। পৃথিবীর অনেক স্থানের আবরণ কেবলমাত্র ইহাদেরই দেহে নির্মিত হইয়াছে। আমাদের আবাস-গ্রহের তরুণাবস্থায় বোধহয় এই কীটগণ অসংখ্য পরিমাণে সমুদ্রের বাস করিত। তাহাদের রাশীকৃত মৃত দেহে কত বৃহৎ পর্বত সৃষ্টি হইয়া সমুদ্র-গর্ভ হইতে মাথা তুলিয়াছে। সমুদ্রের বালুকা অণুবীক্ষণ দিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, তাহাদের অর্ধেক ইহাদের কঠিন গাত্রাবরণ। রুসিয়ার প্রকাণ্ড চুনের পর্বতগুলি ইহাদের দেহে নির্মিত। যে চা-খড়ির পর্বত ফ্রান্স দেশস্থ শ্যাম্পেন হইতে ইংলন্ডের মধ্য পর্যন্ত বিস্তৃত, তাহা এই জীবদেহের স্তূপ মাত্র। যে চা-খড়ির দ্বারা প্রায় প্যারিসের সমগ্র ভূভাগ নির্মিত, তাহা ইহাদেরই দেহ-সমষ্টি। এই কীট-সমষ্টির উপরে কত বিদ্রোহ, কত বিপ্লব, কত রক্তপাত হইয়া গেছে, ও হইবে। এই কীট-সমষ্টির উপর সভ্যতার উন্নততম প্রাসাদ নির্মিত। প্রকৃত কথা এই যে, এই ক্ষুদ্র কীটগণের মৃতদেহ-রাশির উপরে জগতের আর-এক জাতীয় উন্নততর কীটাণু ক্রীড়া করিতেছে!

ডর্বিঞি (Dorbigny) তিন গ্র্যাম বালুকার মধ্যে চারি লক্ষ চল্লিশ সহস্র ফরামিনিফেরার গাত্রাবরণ পাইয়াছেন। ইহাদের কত দেহ যে পৃথিবীর ভূভাগের আয়তন বর্ধিত করিতে নিযুক্ত হইয়াছে তাহা কল্পনারও অগম্য। ইহাদের স্তূপে অ্যালেকজান্দ্রিয়ার বন্দর ক্রমশ পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে, ইহাদের স্তূপে সমুদ্রের কত স্থানের তীরভাগ নির্মিত হইয়াছে। প্রবাল এবং অন্যান্য দুই-একটি সামুদ্রিক পদার্থের ন্যায় ইহারাও সমুদ্রের মধ্যে অনেক দ্বীপ নির্মাণ করিয়াছে। এই চক্ষুর অদৃশ্য পদার্থ সমুদ্রের বিশাল উদর পূর্ণ করিয়া ক্রমে ক্রমে কীরূপে দ্বীপ ও পর্বতসমূহ নির্মাণ করে ভাবিয়া দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়।

ইহাদের দেহ আঠাবৎ পদার্থে নির্মিত। স্বীয় গাত্রাবরণের মধ্য দিয়া ইহারা শাখা-প্রশাখাবান অঙ্গ বহির্গত করে, এই অঙ্গ দ্বারা তাহারা চলা-ফিরা করিয়া থাকে। ইহাদের ওই ক্ষুদ্রতম হস্তপদে আবার বিষাক্ত পদার্থ আছে। দেখা গিয়াছে, ইন্‌ফিউসোরিয়া (Infusoria) প্রভৃতি কীটের গাত্রে ইহাদের বিষাক্ত হস্ত লাগিলে তৎক্ষণাৎ তাহারা অচল হইয়া যায়। এইরূপে তাহারা শিকার করিয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র কীটগণ নিষ্ঠুর মাংসাশী, ইহারা আবার কত কীটাণুর বিভীষিকাস্বরূপ। ইহারা আবার আপনাদিগের ক্ষুদ্র কীটাণু-রাজ্যে আক্রমণ করে, সংহার করে, কতই গোলযোগ করে। দুর্জাদ্যাঁ (Durjadin) দেখিয়াছেন, ইহারা ইচ্ছা করিলে আপনার শরীর হইতে নূতন হস্তপদ নির্মিত করিতে পারে, প্রয়োজন অতীত হইয়া গেলেই পুনরায় তাহা আপনার শরীরের সহিত মিশাইয়া ফেলে। ইহাদেরও শরীরে এ পর্যন্ত পাকযন্ত্র দেখা যায় নাই। ইহাদের সুদৃশ্য গাত্রাবরণ নানা প্রকার। ইহাদের বিভিন্ন গাত্রাবরণ অনুসারে ইহাদের জাতির ভিন্নতা নিরূপিত হয়।

সমুদ্রে নক্তালোকা (Noctiluca) নামক কীটের বিষয় দুই-এক কথা বলা যাউক। বাল্মীকি সমুদ্র-বর্ণনায় লিখিয়াছেন যে, "স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড শৈল। উহা অতলস্পর্শ। ভীম অজগরগণ গর্ভে লীন রহিয়াছে; উহাদের দেহ জ্যোতির্ময়। সাগর-বক্ষে যেন অগ্নি-চূর্ণ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।' এখনকার নাবিকেরাও সমুদ্র ভ্রমণ করিবার সময়, সময়ে সময়ে দেখিতে পান, সাগরবক্ষে যেন অগ্নিচূর্ণ প্রক্ষিপ্ত রহিয়াছে। দাঁড়ের আঘাতে এবং তরঙ্গের গতিতে তাহাদের উজ্জ্বলতা আরও বৃদ্ধি হইয়া উঠে। সমস্ত সমুদ্র যেন একটি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড বলিয়া বোধ হয়। কখনো ভাঁটা পড়িয়া গেলে দেখা যায় পর্বত-দেহে, সামুদ্রিক তৃণসমূহে ও তীর-ভূমিতে যেন আগুন লাগিয়াছে। বাল্মীকির সময়ে যাহা লোকে অজগরের দেহজ্যোতি বলিয়া মনে করিত, বৈজ্ঞানিকেরা অসংখ্য ক্ষুদ্র কীটের দেহ-নিঃসৃত ফস্‌ফরিয় আলোক বলিয়া জানিয়াছেন। সেই কীটদিগের নাম নক্তালোকা। ঝটিকামত্ত অন্ধকার রাত্রে রজত ফেনময় অধীর তরঙ্গের দ্বারা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া এই জ্বলন্ত কিরণ কী সুন্দর শোভাই ধারণ করে।

ইনফিউসোরিয়া (Infusoria) কীট অ্যামিবির ন্যায় পরিষ্কার বা লবণাক্ত, শীতল বা উষ্ণ সকল প্রকার জলেই বাস করে। সপ্তদশ শতাব্দীর বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ লয়বেনহয়েক ইহাদের প্রথম আবিষ্কর্তা, এই চির-অস্থির কীটাণুগণ এত ক্ষুদ্র যে, একবিন্দু জলে ইহাদের কোটি কোটি বাস করিতে পারে। গঙ্গা প্রতিবৎসর এত ইনফিউসোরিয়া সমুদ্রকে উপহার দিতেছে যে, তাহা একত্র করিলে ইজিপ্টের পিরামিড অপেক্ষা ছয়-সাত গুণ অধিক হয়। মরুপ্রদেশে উৎকৃষ্ট জীবগণ বাস করিতে পারে না, কিন্তু সেখানেও ইহারা অসংখ্য পরিমাণে জীবন ধারণ করিয়া আছে। পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতের পরিমাণ অপেক্ষা গভীরতর সমুদ্র-তলদেশে এই অসংখ্য জীবিত-কণা বাস করিতেছে। মনুষ্যের ন্যায় এই অদৃশ্য কীটাণুগণও এই মহান জগতের একটি অংশ। এই কীটাণুদিগকে জগৎ হইতে বাদ দাও, জগৎ এক বিষয়ে অসম্পূর্ণ হইল। এমন স্থান নাই, যেখানে ইহারা নাই। সমুদ্রে, নদীতে, পুষ্করিণীতে, এমন-কি, আমাদের শরীরস্থ রসে ইহারা সঞ্চরণ করে। অনেক স্থানে পৃথিবীর স্তর বহুদূর ব্যাপিয়া কেবল মাত্র ইহাদের দেহে নির্মিত। ইহাদিগের দেহের নিমিত্তই গঙ্গা নীল প্রভৃতি নদীতীরস্থ কর্দমে উর্বরা শক্তি জন্মে। ইহাদের ক্ষুদ্রতম গাত্রাবরণ জমিয়া এক প্রকার প্রস্তর নির্মিত হয়। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ কহেন– অনেক উচ্চ পর্বত ইহাদেরই দ্বারা নির্মিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র– বিন্দু-জলে যাহারা কোটি কোটি বাস করিতে পারে– তাহাদের স্তূপে পর্বত নির্মিত হইয়াছে।

এই কীটাণুগণ, কেহ কেহ জলে, কেহ বা আর্দ্র শৈলে, কেহ কেহ বা অন্য জন্তুর শরীরে বাস করিয়া থাকে। এমন-কি, স্ত্রীলোকের স্তন-দুগ্ধেও ইহাদিগকে পাওয়া গিয়াছে। পাঠকেরা যদি কেহ অণুবীক্ষণ দিয়া এই কীটাণুগণকে দেখিতে চান, তবে এক পাত্র জলে, ডিম্বের শ্বেতাংশ ফেলিয়া মুক্ত স্থানে রাখিয়া দিবেন, ইহাতে ফসফেট অফ সোডা বা কার্বোনেট অফ সোডা অথবা নাইট্রেট কিংবা অক্সালেট্‌স অফ অ্যামোনিয়া দিলে এই কীটাণুগণ অতি শীঘ্র শীঘ্র বর্ধিত হইয়া উঠিবে।

এই কীটাণুদিগের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের প্রভেদ আছে। কিন্তু গর্ভ ভিন্ন অন্য কারণেও ইহারা জন্মলাভ করে। ইহাদের অসংখ্য সঙ্গীগণ হইতে একটি কীটাণুকে স্বতন্ত্র লইয়া যদি

অণুবীক্ষণ দিয়া পরীক্ষা করা যায়, তবে দেখা যাইবে, ইহার দেহের মধ্যভাগ ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, এবং ক্রমে নিম্ন প্রদেশে কতকগুলি চলনেন্দ্রিয়সূত্র দেখা যাইতেছে। অবশেষে ক্রমশ ওই কীট একেবারে দুই ভাগে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, এবং এইরূপে দুইটি কীটের জন্ম হয়। বিচ্ছিন্ন অংশটিরও মুখ এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে যেমন "আত্মাবৈ জায়তে পুত্রঃ' এমন মনুষ্যের মধ্যে নহে। এইরূপে একটি ইনফিউসোরিয়া, যাহা কত যুগ পূর্বে বর্তমান ছিল, তাহারই খণ্ডাংশ হয়তো আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। দেখা গিয়াছে এক মাসের মধ্যে দুইটি কীটাণুর বিচ্ছিন্ন শরীরে ১০ লক্ষ ৪৮ সহস্র কীটাণু জন্মলাভ করিয়াছে। ৪২ দিনে একটি কীটাণু শরীর হইতে এক কোটি ছত্রিশ লক্ষ চল্লিশ সহস্র কীটাণু জন্মিয়াছে।

এই অতি ক্ষুদ্র কীটাণুর গাত্রেও আবার ক্ষুদ্রতর কীটাণু সঞ্চরণ করিতেছে, বৃহত্তর কীটাণুর গাত্র তাহার নিবাস ও আহারস্থান। ঘণ্টাকতক মাত্র এই কীটাণুদিগের জীবনকাল। কিন্তু একটি আশ্চর্য দেখা গিয়াছে, যাহাতে বায়ু না পায় এমন করিয়া যত্নপূর্বক ইনফিউসোরিয়াকে ঢাকিয়া রাখো, যতদিন পরেই হউক-না-কেন, গাত্রে এক বিন্দু জল লাগিলেই পুনরায় বাঁচিয়া উঠিবে। এইরূপে এই দুই ঘণ্টার জীব শত বৎসর মৃত থাকিয়া আবার মুহূর্তে বাঁচিয়া উঠিতে পারে।

এই কীটাণুদিগের আর-একটি আশ্চর্য প্রকৃতি আছে। ইহাদের শরীরের কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেও ইহারা মরিয়া যায় না। মৃত অর্ধাংশ অদৃশ্য হইয়া যায়, আর জীবিত অংশটি যেন অতি নিশ্চিতভাবে পুনরায় খেলা করিয়া বেড়ায়, যেন তাহার কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নাই, অথচ সে হয়তো তাহার পূর্ব শরীরের ষোড়শ অংশ বিভক্ত হইয়া গিয়াছে।

যে জলবিন্দুতে এই কীটাণুগণ সাঁতার দিয়া বেড়ায়, তাহাতে যদি অ্যামোনিয়াসিক্ত একটি পালক ডুবানো যায়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাদের গতি বন্ধ হইয়া যায়। চলিবার জন্য তাহারা হাত-পা সঞ্চালন করিতে থাকে বটে কিন্তু চলিতে পারে না। ক্রমে তাহাদের শরীর

গলিয়া যাইতে থাকে। আবার যদি তাহাতে ভালো জল দেওয়া যায়, তৎক্ষণাৎ তাহাদের গলন বন্ধ হইয়া যায়, আবার অবশিষ্ট অংশ সুখে সাঁতার দিয়া বেড়ায়।

এক প্রকার ইনফিউসোরিয়া আছে, উদ্ভিদ অথবা প্রাণীগণের গলিত দেহে তাহাদিগকে পাওয়া যায় কিন্তু যখনই অন্যান্য কীট তাহাদের স্থান অধিকার করে, তখনই তাহারা অদৃশ্য হইয়া যায়। অর্থাৎ অন্য জাতীয় কীটেরা তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলে। আবার যখন সেই-সমস্ত দ্রব্য এমন পচিয়া যায় যে আর অন্য কোনো কীট তাহাতে থাকিতে পারে না, তখন তাহারা পুনরায় আবির্ভূত হয়। দাঁতে যে শ্বেত পদার্থ আছে তাহাতেও লয়বেনহয়েক এই কীটাণু দেখিতে পাইয়াছিলেন। অনেক রোগগ্রস্ত প্রাণীর শরীরস্থ রসেও ইহাদের বসতি। এক প্রকার ইনফিউসোরিয়া আছে, তাহার শরীর স্ক্রুর ন্যায় পেঁচালো। ইহারা এমন আশ্চর্য বেগে ঘুরিতে থাকে যে, চোখ দিয়া দেখা যায় না, এবং কেন যে অত বেগে ঘুরিতেছে তাহার কোনো কারণ ভাবিয়া পাওয়া যায় না। আর-এক প্রকার কীটাণু আছে, তাহাদের শরীর যেন তাহাদের নিজের নহে। ইহাদের অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর কীটসমূহ ইহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে তাড়না করিয়া বেড়ায়, এবং ধরিতে পারিলেই তাহাদের গাত্রে চড়িয়া বসে, এবং বেচারীর সমস্ত রক্ত শোষণ করে এবং রহিয়া বসিয়া তাহাকেও ভক্ষণ করিয়া ফেলে। উকুন বা ছারপোকার মতো একটুতেই ইহারা সন্তুষ্ট নহেন, যতক্ষণে সমস্ত আহার্য না ফুরাইয়া যায় ততক্ষণ ইহারা ছাড়েন না। এ কীটাণুদের শুদ্ধ এই এক যন্ত্রণা নহে, আর-এক প্রকারের কীটাণু ইহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আছে, যেমন ইহারা কাছে আসে,অমনি তাহারা ইহার শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এবং অল্প সময়ের মধ্যে সে বেচারীর শরীরে ঘর-কন্না ফাঁদিয়া বসে, অবশেষে পুত্র-পৌত্র লইয়া সুখে তাহার শরীর ভক্ষণ করিতে থাকে। একটি কীটাণুর শরীরের মধ্যে অমন পঞ্চাশটা ক্ষুদ্রতর ক্ষুদ্রতম কীটাণু পাওয়া গিয়াছে।

ভারতী বৈশাখ, ১২৮৫

99

দেবতায় মনুষ্যত্ব আরোপ

হর্বর্ট্ স্পেন্সর তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে "The use of Anthropomorphism" নামক প্রবন্ধে দেবতায় মনুষ্যত্ব আরোপ সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিয়াছেন, তৎবিষয়ে আমাদের কতকগুলি বক্তব্য আছে। অগ্রে, তিনি যাহা বলেন, তাহা প্রকাশ করি, পরে আমাদের যাহা মত তাহা ব্যক্ত করিব।

স্পেন্সর বলেন মনুষ্য-সমাজে যখন যে ধর্মমতের প্রাদুর্ভাব থাকে, তখনকার পক্ষে সেই ধর্মমতই সর্বাপেক্ষা উপযোগী। এ কথা শুনিলেই হয়তো অনেকে আশ্চর্য হইবেন, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই ইহার প্রমাণ পাইবেন।

মনুষ্য-বিশেষ এবং মনুষ্য-সমাজ উভয়েই গাছের মতো করিয়া বাড়ে, ইহাদের মধ্যে হঠাৎ-আরম্ভ কিছুই নাই। তাহা যদি সত্য হয়, তবে মনুষ্যের ধর্মমত, মনুষ্যের রাজ্যতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ন্যায় অবস্থানুসারে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। যে সময়ে যেরূপ ধর্ম প্রয়োজনীয়, সে সময়ে সেইরূপ ধর্ম আপনাআপনিই উদ্ভূত হইয়া থাকে। কেন হইয়া থাকে তাহা বিস্তৃত করিয়া বলা যাক।

ইহা সাধারণত সকলেই স্বীকার করেন যে, ঈশ্বরকে কল্পনা করিতে গেলে, আমরা তাঁহাতে আমাদের নিজত্ব আরোপ না করিয়া থাকিতে পারি না। ইহা আমাদের মনের ধর্ম। ন্যূনাধিক পরিমাণে সকল ধর্মেই এই মানব-স্বভাব লক্ষিত হয়। কোনো ধর্মে ইহারই মাত্রাধিক্য দেখিলেই আমাদের ঘৃণা উদয় হয়। যখন শুনা যায়, পলিনেসীয় জাতির ধর্মে তাহাদের দেবতারা মৃত মনুষ্যের আত্মা ভক্ষণ করে, অথবা প্রাচীন গ্রিসীয়দিগের দেবতারা কুটুম্ব-মাংস ভক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া জঘন্যতম পাপাচরণ পর্যন্ত কিছুই বাকি রাখে নাই, তখন আমাদের মনে অতিশয় ঘৃণা উদয় হয়। কিন্তু যদি আমরা যুক্তি সহকারে বিবেচনা করিয়া দেখি, যদি আমরা দেবভক্তদিগের মনোভাব ও সময়ের অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে, সেই ধর্মই সেই অবস্থার উপযোগী, অতএব তাহা নিন্দনীয় নহে।

কারণ, ইহা কি সত্য নহে যে কেবল অসভ্য দেবতাদেরই ভয়ে অসভ্য মনুষ্যেরা শাসনে থাকিতে পারে, তাহাদের প্রকৃতি যতই দুর্দান্ত হয় তাহাদের শাসন বিভীষিকা ততই নিদারুণ হওয়া আবশ্যক, ও শাসন নিদারুণ হইতে গেলে শাসনকর্তা দেবতাদেরও সেই পরিমাণে নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা-পরায়ণ হওয়া আবশ্যক? বিশ্বাসঘাতক, চৌর্য-বৃত্তিপরায়ণ, মিথ্যাবাদী হিন্দুরা যে তপ্ত-তৈল-কটাহপূর্ণ নরকে বিশ্বাস করে, ইহা কি তাহাদের পক্ষে ভালো হয় নাই? এবং এইরূপ নরক সৃষ্টি করিতে পারে এমন নিষ্ঠুর দেবতা থাকাও আবশ্যক, সেইজন্যই তো তাহাদের দেবতারা ফকিরদের আত্মপীড়ন দেখিয়া সুখী হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে, অসভ্য মনুষ্যের পক্ষে অসভ্য দেবতাই উপযোগী। আমরা যে ঈশ্বরকে আমাদের নিজ স্বভাবের আদর্শ করিয়াই গড়ি, তাহা আমাদের পক্ষে শুভ বৈ অশুভ নহে।

আবার ইহাও দেখা গিয়াছে, যে ধর্ম যে অবস্থার উপযোগী নহে, সে ধর্ম সে অবস্থায় বলপূর্বক প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতে গেলে কোনো মতে টিঁকিতে পারে না। অসভ্য দেশে খৃস্টান ধর্ম নামেমাত্র খৃস্টান ধর্ম, অসভ্যদিগের প্রাচীন ধর্ম তাহার অভ্যন্তরে বিরাজ করিতে থাকে।

স্পেন্সরের মত উপরে উদ্‌ধৃত করা গেল, এক্ষণে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা বলি।

স্পেন্সরের প্রথম যুক্তি এই- মনুষ্য দেবতাকে নিজের আকার দিয়া পূজা করে অতএব, মনুষ্যেরও যেরূপ পরিবর্তন হইতে থাকে, দেবতারও সেইরূপ পরিবর্তন হইতে থাকে। মনুষ্য যখন ক্রোধপরায়ণ থাকে, তখন তাহাদের দেবতারাও ক্রোধপরায়ণ থাকে, মনুষ্য যখন দয়াবান হয়, তখন তাহাদের দেবতারাও দয়াবান হয়, ইত্যাদি। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, একটি জাতির দেব চরিত্রে বা ধর্মে যত দিন গর্হিত আচরণের উল্লেখ থাকিবে, ততদিন জানা যাইবে যে, সে জাতির স্বভাবও গর্হিত।

স্পেন্সরের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, “যেমন মানুষ, তেমনি দেবতাই তাহার পক্ষে ঠিক উপযোগী।’ তাহা হইতে সিদ্ধান্ত হয় যে, সকল ধর্মই স্ব স্ব ভক্তের নিকট উপযোগী। কারণ পূর্বেই প্রমাণ হইয়াছে, মানুষ স্বভাবতই নিজেরই মতো করিয়া দেবতা গড়িয়া লয়, এখন যদি প্রমাণ হয়, সেইরূপ দেবতাই তাহার পক্ষে যথার্থ উপযোগী, তাহা হইলেই প্রমাণ হইল যে, সকল জাতিরই নিজের নিজের ধর্ম নিজের নিজের পক্ষে উপযোগী। স্পেন্সর ধর্মের উপযোগিতা কাহাকে বলিতেছেন তাহাও এখানে বলা আবশ্যক। দুষ্কর্ম হইতে বিরত করিয়া রাখাই ধর্মের উপযোগিতা।

স্পেন্সরের তৃতীয় যুক্তি এই যে, যত দিন একটি দ্রব্যের উপযোগিতা থাকে, তত দিনই সে টিকিতে পারে, তাহার ঊর্ধ্বে নহে। অতএব জাতিবিশেষের স্বভাব যখন পরিবর্তিত হয়, তখন তাহাদের প্রাচীন ধর্ম অনুপযোগী হইয়া পড়ে, অতএব আপনাআপনিই ধ্বংস হইয়া যায়। তাহার পূর্বে যদি নূতন ধর্ম তাঁহাদের মধ্যে প্রচার করিতে যাও, তবে তাহা স্থান পায় না।

স্পেন্সর যে বলিতেছেন, যে, মনুষ্যেরা যখন নিজে ক্রোধপরায়ণ থাকে, তখন তাহাদের দেবতারাও ক্রোধপরায়ণ হয়, তাহাদের নিজের যে-সকল দুষ্প#বৃত্তি থাকে দেবতাদিগের প্রতিও তাহাই আরোপ করে, তাহা নিতান্ত অঙ্গহীন অসম্পূর্ণ যুক্তি। যদি এমন হইত, মনুষ্য সর্বতোভাবে নিজের মন হইতেই দেবতা কল্পনা করিত, বাহ্য-জগতের সহিত, আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সহিত দেবতা-কল্পনার কোনো যোগ না থাকিত, তাহা হইলে স্পেন্সরের কথা সত্য হইত। কিন্তু তাহা তো নহে। ধর্মের শৈশব অবস্থায় মনুষ্যেরা বাহ্য প্রকৃতির এক-এক অংশকে দেবতা বলিয়া পূজা করে। তখন সূর্য, অগ্নি, বায়ু, সকলই দেবতা। যদি কোনো ভক্ত অগ্নিকে নিষ্ঠুর বলিয়া কল্পনা করে, তবে তাহা হইতে প্রমাণ হয় না যে, তাহার নিজের স্বভাব নিষ্ঠুর বলিয়া তাহার দেবতাকেও নিষ্ঠুর করিয়াছে, যদি কেহ বায়ুকে কোপন-স্বভাব কল্পনা করে, তবে তাহা হইতে অনুমান করা যায় না যে, সে নিজে কোপন-স্বভাব। সে যখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছে, অগ্নি সহস্র জিহ্বা বিকাশ করিয়া কুটির, গ্রাম, বন, ধ্বংস করিয়া ফেলিতেছে, সে তখন নিজে দয়ালু হইলেও

অগ্নিকে নিষ্ঠুর দেবতা সহজেই মনে করিতে পারে। বাহ্য জগতে সুখ দুঃখ, বিপদ সম্পদ, জীবন মৃত্যু দুইই আছে অতএব যাহারা বাহ্য-জগতের উপর দেবতা প্রতিষ্ঠা করে, তাহারা কতকগুলি দেবতাকে স্বভাবতই নিষ্ঠুর বলিয়া কল্পনা করে। বিশেষত অসভ্য অবস্থায় পদে পদে বিপদ, পদে পদে মৃত্যু, অতএব সে অবস্থায় নির্দয় দেবতা কল্পনা কেবলমাত্র মনের উপরেই নির্ভর করে না। অতএব আমি দয়ালুই হই, আর নিষ্ঠুরই হই, অগ্নির ধ্বংসশক্তিকে যতদিন দেবতা বলিয়া মনে করিব, ততদিন তাহা নিষ্ঠুর বলিয়া জানিব। আমার স্বভাবের পরিবর্তন হইতে পারে, কিন্তু অগ্নির স্বভাবের পরিবর্তন হইবে না তো। অতএব দেবতায় হীন স্বভাব হইতে মনুষ্যের হীন স্বভাব কল্পনা করা সকল সময় ঠিক খাটে না। আমাদের শাস্ত্র হইতে ইহার শত শত প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। ব্রহ্মার নিজ কন্যার প্রতি আসক্তির বিষয়ে সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু সেরূপ ঘৃণিত আচরণ আর্যদিগের মধ্যে কখনোই প্রচলিত ছিল না, তবে এরূপ অসংগত কল্পনা কী করিয়া প্রাচীন আর্যদের হৃদয়ে উদিত হইল?

শতপথ ব্রাহ্মণে আছে– প্রজাপতি নিজের দুহিতা আকাশ অথবা উষাকে দেখিয়া তাহার সহিত সংগত হইলেন। দেবতাদের চক্ষে এ আচরণ পাপ, অতএব তাঁহারা কহিলেন, যিনি নিজের দুহিতা ও আমাদের ভগ্নীর প্রতি এরূপ আচরণ করেন, তিনি পাপ করেন, অতএব তাঁহাকে বিদ্ধ করো। রুদ্র তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন।– আমাদের বোধ হয় ইহা উষার প্রতি কুজ্‌ঝটিকা-আক্রমণের রূপক। কারণ ভাগবত পুরাণের এক স্থলে আছে– পিতার অধর্মে মতি দেখিয়া তাঁহার পুত্র মুনিগণ মরীচিকে পুরোভাগে লইয়া তাঁহাকে এই বলিয়া তিরস্কার করিলেন, "তুমি যে আত্মদমন না করিয়া নিজ-দুহিতাগামী হইয়াছ, এমন পূর্বেও কখনো কৃত হয় নাই, এমন পরেও কখনো কৃত হইবে না। হে জগদ্‌গুরু, যাহাদের অনুসরণ করিয়া লোকে ক্ষেম প্রাপ্ত হয় এমন তেজস্বীদের পক্ষে এ কার্য কিছুতেই প্রশংসনীয় নহে!' নিজের সন্তানদিগকে এইরূপ কথা কহিতে শুনিয়া প্রজাপতি লজ্জিত হইলেন ও নিজ দেহ পরিত্যাগ করিলেন। সেই ঘোর দেহ দিক্ আচ্ছন্ন করিল ও তাহাই পণ্ডিতেরা অন্ধকার নীহার বলিয়া জানেন।

ভাগবত-পুরাণে ব্রহ্মার কন্যা উষার পরিবর্তে বাণী রহিয়াছে, আমরা উভয়কে মিলিত করিলাম। উপরে যাহা উদ্‌ধৃত হইল তাহাতেই দেখা যাইবে, ব্রহ্মার পাপাচরণ আর্যদিগের দ্বারা নিতান্ত নিন্দনীয় বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু নিন্দনীয় হউক বা না হউক, তাঁহারা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন, কুজ্‌ঝটিকা বলপূর্বক উষাকে আচ্ছন্ন করিতেছে, ইহা তাঁহাদের পক্ষে সত্য ঘটনা-স্বরূপ।

গ্রীসীয় পুরাণে কোনো দেবতা যদি নিজের কুটুম্বকে ভক্ষণ করিয়া থাকেন, তবে তাহার কারণ কি এই যে, গ্রীসীয়গণ এমন অসভ্য ছিল যে, কুটুম্ব মাংস ভক্ষণ করিত, অথবা কুটুম্ব মাংস ভক্ষণ করা অন্যায় মনে করিত না? রজনী ও প্রভাত সম্বন্ধে এক সমস্যা শুনিয়াছিলাম, যে, জন্মাইয়া মাকে সন্তান খাইয়া ফেলিতেছে। উপরি-উক্ত গ্রীসীয় কাহিনীও কি সেরূপ কোনো একটা রূপকমূলক হইতে পারে না? যদি ইহা সত্য হয় যে, গ্রীসীয়গণ কুটুম্বকে ভক্ষণ করিত না ও কুটুম্ব ভক্ষণ করা পাপ মনে করিত, তবে তাহাদের দেবতাদের কেন কুটুম্ব মাংসে প্রবৃত্তি জন্মিল। যদি বল, অসভ্য অবস্থায় এককালে হয়তো গ্রীসীয়গণ আত্মীয়দিগকে উদরসাৎ করিয়া অধিকতর আত্মীয় করিত, সেই সময়েই উক্ত কাহিনীর আরম্ভ হয়– তবে, যখন সভ্য অবস্থায় গ্রীসীয়দের সে বিষয়ে মত ও আচরণ পরিবর্তিত হইল, তখন তাহাদের বিশ্বাসও পরিবর্তিত হইল না কেন?

মানুষেরা যে-সকল কার্য প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বলিয়া অনুষ্ঠান করে না ও যে-সকল কার্যকে নিতান্ত নিন্দনীয় জ্ঞান করে, সে-সকলও যদি তাহাদের দেবতায় আরোপ করে, তবে কেমন করিয়া বলিব যে, তাহারা নিজের গুণ-দোষগুলিই দেবতায় আরোপণ করে?

অবস্থানুসারে সকল ধর্মই উপযোগী ইহাই প্রমাণ করিতে গিয়া স্পেন্সর বলিতেছেন, "ইহা কি সত্য নহে যে, কেবল অসভ্য দেবতাদের ভয়েই অসভ্য মনুষ্যেরা শাসনে থাকিতে পারে, তাহাদের প্রকৃতি যতই দুর্দান্ত হয়, তাহাদের শাসন-বিভীষিকা ততই নিদারুণ হওয়া আবশ্যক ও শাসন নিদারুণ হইতে গেলে শাসনকর্তা দেবতাদেরও সেই পরিমাণে নিষ্ঠুর প্রতিহিংসাপরায়ণ হওয়া আবশ্যক।' স্পেন্সরের এ কথাটাও সর্বাঙ্গীণ সত্য

নহে। ধর্মের একটা অবস্থা আছে, যখন কার্যসিদ্ধির জন্য, বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্যও স্বভাবত অনিষ্টকারী দেবতাদিগের হিংস্র-প্রবৃত্তি নিবারণ করিবার জন্য দেব-আরাধনা করাই ধর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে। চুরি করিতে যাইতেছি, দেবতার পূজা করিলাম, খুন করিতে যাইতেছি, দেবতার পূজা করিলাম, কার্যসিদ্ধি হইবে। শত্রু দেশ আক্রমণ করিয়াছে, দেবতার পূজা করিলাম, বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব। ওলাবিবি, শীতলা মনসা প্রভৃতি দেবতাদের পূজা করি, নহিলে তাহারা আমার অনিষ্ট করিবে। এরূপ অবস্থায় দেবতারা যতই নিদারুণ হউক-না-কেন, উপাসকদিগের দুষ্প#বৃত্তি দমনের জন্য তাহারা কিছুমাত্র উপযোগী নহে। বরঞ্চ দুষ্প#বৃত্তির উত্তেজক ও দুষ্কর্মের সহায়। কালীর উপাসনা করিয়া ও কালীর নিকট নরবলি দিয়া দস্যুদিগের হিংস্র-প্রবৃত্তির কি কিছু উপশম হয়? তাহারা কি তাহাদের দুষ্কর্মে দ্বিগুণ বল পায় না? অন্য শত সহস্র বাহ্য কারণ হইতে দস্যুদের স্বভাব পরিবর্তন হইতে পারে। কিন্তু যুগযুগান্তর কালী পূজা করিয়া আসিলে তাহাদের নিষ্ঠুরতা বর্ধিত হইবে বৈ হ্রাস হইবে না। তবে দেবতা নিদারুণ হওয়াতে উপাসকের দুর্দান্ত ভাবের দমন হইল কই? বরঞ্চ সে আরও স্ফূর্তি পাইল। সমাজের যখন কিয়ৎ পরিমাণে উন্নতি হইয়াছে, যখন, দেবতাদের কতকগুলি শুভ আদেশ আছে বলিয়া লোকের বিশ্বাস জন্মিয়াছে ও সেইগুলি লঙ্ঘন করিলে দেবতার কোপ দৃষ্টিতে পড়িতে হইবে বলিয়া ধারণা হইয়াছে, তখন স্পেন্সরের কথা অনেকটা খাটে। কিন্তু সে অবস্থা সমাজের অনেক উন্নতির ফল। এখনও শত শত লোক চারি দিকে দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা কেবলমাত্র বিপদ-সম্পদের জন্যই দেব-আরাধনা করে, তাহারা অন্যায় মকদ্দমা জিতিবার জন্য, নিরীহ ব্যক্তিকে জেলে পাঠাইবার জন্য দেবতার পূজা করে ও একবার মনেও করে না যে, দেবতার আদেশ লঙ্ঘন করিবার জন্যই দেবতার প্রসাদ প্রার্থনা করিতেছি। তাহারা তিন সন্ধ্যা দেবতার পূজা করিতে ভোলে না, কিন্তু দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা অসংকোচে শত সহস্র পাপাচরণ করে। পূজার একটা ফুল কম পড়িলে, একটা সামান্য ত্রুটি থাকিলে তাহারা সশঙ্কিত হইয়া উঠে, অথচ অন্যায় কাজ করিতে কিছু মনেই করে না! দেবতার নিকট রক্তপাত করিয়া ও দেবতার নিকট মন্ত্রপাঠ করিয়া ইহাদের স্বভাবের কি উন্নতি হইতে পারে?

এইস্থলে হর্বার্ট স্পেন্সর একটি গোঁজামিলন দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন–

"Certainly, such conceptions as those of the Greeks, who ascribed to the personages of their Pantheon every vice, are repulsive enough। But... the question to be answered is, whether these beliefs were beneficent in their effects on those who held them।'

এই-সকল বিশ্বাস যে উপাসকদিগের পক্ষে যথার্থ হিতসাধক তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য বলিয়াছেন যে, অসভ্যদের প্রকৃতি যতই দুর্দান্ত হয় ততই তাহাদের শাসন কঠোর হওয়া আবশ্যক। এবং শাসন কঠোর হইতে গেলেই শাসনকর্তা দেবতাদিগকেও নিষ্ঠুর, প্রতিহিংসাপরায়ণ হওয়া আবশ্যক। যতটুকু স্পেন্সরের যুক্তির পক্ষে আবশ্যক, ততটুকুই তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, অবশিষ্ট অংশটুকু গোপন করিয়া গিয়াছেন। নিষ্ঠুরতাই কিছু একমাত্র পাপ-প্রবৃত্তি (Vice) নহে। দেবতা নিষ্ঠুর না হইতেও পারে, দেবতা যদি চৌর্যবৃত্তিপরায়ণ শঠ হয়,দেবতা যদি মিথ্যাবাদী ভীরু হয়, তাহা হইলে সে দেবতা উপাসকের কী হিতসাধন করিতে পারে জানিতে ইচ্ছা করি! সকল দেবতারই যদি উপযোগিতা থাকে এমন মত হয়, তবে আমাদের এ প্রশ্নের উত্তর কী? সমস্ত ছাঁটিয়া এই দাঁড়ায় যে, স্পেন্সরের মতে অসভ্য অবস্থায় নিষ্ঠুর দেবতারই উপযোগিতা আছে। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, এ কথাও সর্বতোভাবে সত্য নহে। সমাজের এমন অবস্থা আছে, যখন দেবতা যতই নিষ্ঠুর হউক-না-কেন, উপাসকদিগের দুর্দান্ত ভাব আরও বর্ধিত হইতে থাকে বৈ হ্রাস পায় না। যদি বল, সে সময়ে তাহাদের নিজ ধর্ম ব্যতীত আর কোনো ধর্ম তাহাদের নিকট টিকিতে পারে না, অতএব সেই ধর্মই তাহাদের পক্ষে একমাত্র সম্ভব ধর্ম ও সেই হিসাবে উপযোগী ধর্ম, তবে আমরা বলি তাহার যথেষ্ট প্রমাণ কোথায়? স্পেন্সর যে একমাত্র দৃষ্টান্ত উদ্‌ধৃত করিয়াছেন তাহা আমাদের নিকটে যথেষ্ট বলিয়া বোধ হইল না। তিনি বলেন, ফিজি দ্বীপবাসী ভেওয়া খৃস্টান অনুতাপীগণ আত্মার অশান্তিবশত অনেকক্ষণ ধরিয়া আর্তনাদ করিতে থাকে। অবশেষে শ্রান্ত হইয়া মূর্ছিত হইয়া পড়ে;

চেতনা লাভ করিয়া তাহারা পুনরায় প্রার্থনা করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া স্পেন্সর কহিতেছেন, ফিজি দ্বীপবাসীগণ নিতান্ত অসভ্যজাতি। তাহারা মানুষ খায়, শিশু হত্যা করে, নরবলি দেয়। তাহাদের পরিবারের মধ্যেও পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিশ্বাস নাই। তাহারা সর্পের পূজা করে। দেখা যাইতেছে, তাহারা খৃস্টান হইয়া খৃস্টান ধর্মের প্রতিহিংসা, অনন্ত যন্ত্রণা ও শয়তান-তন্ত্রটুকুই বাছিয়া লইয়াছে। এই নিমিত্তই তাহারা ভয়ে আর্তনাদ করে। তাহাদের সেই পুরাতন সর্প-উপাসনাই খৃস্টান ধর্ম নাম ধারণ করিয়াছে মাত্র। উন্নততর ধর্ম অবলম্বন করিয়া ভেওয়া খৃস্টানগণের যে কিছু উন্নতি হয় নাই, উপরি-উক্ত দৃষ্টান্তে তাহার কিছু প্রমাণ হয় না।

যদি এমন যুক্তি প্রয়োগ কর যে, যতদিন একটি দ্রব্যের উপযোগিতা থাকে ততদিনই সে টিকিতে পারে, তাহার ঊর্ধ্বে নহে, অতএব যে ধর্ম যে দেশে টিকিয়া আছে, সে ধর্ম সে দেশের উপযোগী। তবে সে সম্বন্ধেও আমাদের দুই-একটি কথা আছে।

মনুষ্য স্বভাবে উভয়ই আছে, স্থিতিশীলতা ও পরিবর্তনশীলতা। আবশ্যকের উপযোগী করিয়া পরিবর্তন যে হইয়াই থাকে তাহা নহে। মনুষ্য স্বভাবে কেন, সমস্ত জগতেই এই নিয়ম। প্লায়োসিন যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত ঘোড়ার পায়ে যে অঙ্গুলির অসম্পূর্ণ আরম্ভ বর্তমান রহিয়াছে, তাহা তাহার কোনো কাজে লাগে না, উপযোগিতার নিয়মানুসারে তাহা কেন ধ্বংস হইল না? স্তন্যপায়ী জীবের পুরুষ জাতিরও স্তন আছে, এমন-কি, তাহাদের "mammary glands' পর্যন্ত বর্তমান আছে। অনেকে শুনিয়া থাকিবেন, অনেক পুরুষের স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হইয়াছে। পুরুষ জীবেরা যে কোনো কালে শাবকদিগকে স্তন্যপান করাইয়াছিল তাহার কোনো প্রমাণ নাই। প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্যন্ত যদি পুরুষ মানুষ সন্তানকে স্তন দান করিয়া না থাকে তবে এই অনাবশ্যক প্রত্যঙ্গ কেন পুরুষ শরীরে বর্তমান রহিল?

উপাধ্যায় হেকেল বলেন, জীবিত প্রাণীদিগের মধ্যে দুই প্রকারের উদ্যম আছে; এক কেন্দ্রানুগ (centripetal) যাহাতে করিয়া তাহাদের বংশপরম্পরাগত বিশেষত্ব রক্ষা করে;

আর এক কেন্দ্রাতিগ (centrifugal) যাহাতে করিয়া বাহ্য অবস্থার অনুকূল করিয়া তাহাদের পরিবর্তন সাধন করে। অর্থাৎ নিতান্ত প্রতিকূল অবস্থায় না পড়িলে অনেক অনাবশ্যক অঙ্গপ্রত্যঙ্গও থাকিয়া যায়। "The Genealogy of Animals" নামক প্রবন্ধে উপাধ্যায় হক্সলি যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্‌ধৃত করিয়া দিই–

"I think it must be admitted that the existence of an internal metamorphic tendency must be as distinctly recognized as that of an internal conservative tendency ; and that the influence of conditions is mainly, if not wholly, the result of the extent to which they favour the one, or the other, of these tendencies।'

এই নিয়ম ধর্ম সম্বন্ধেও খাটে। যদি স্বীকার করা যায়, যে অসভ্য অবস্থায় দুর্দান্ত হৃদয় দমনে রাখিবার জন্যই কুম্ভীপাক প্রভৃতি বিভীষিকাপূর্ণ নরক স্বভাবতই কল্পিত হইয়াছিল, তথাপি ইহা নিশ্চয় বলা যায় যে,যত দিন পর্যন্ত কোনো জাতির সেই নরকে বিশ্বাস বর্তমান থাকিবে, ততদিন পর্যন্তই যে, তাহাদের সেই অসভ্য অবস্থা ও দুর্দান্ত হৃদয় আছে বলিয়া প্রমাণ হইবে তাহা নহে। অবস্থা-বিশেষে একটা বিশ্বাসের জন্ম হইলে অবস্থার পরিবর্তনে যে সেই বিশ্বাসের ধ্বংস হয় তাহা নহে। বিশেষত স্বর্গ-নরকের বিশ্বাস শীঘ্র ধ্বংস হইবার কোনো কারণ নাই। তাহার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ সে বিশ্বাসের প্রতিকূল অবস্থাবিশেষ কিছুই বর্তমান নাই। অতএব একবার যাহা বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে, তাহা পুনশ্চ ভাঙিয়া অবিশ্বাস করিবার কোনো কারণ নাই। আমাদের শাস্ত্রোল্লিখিত কুম্ভীপাক প্রভৃতি নরকের উল্লেখ করিয়া হর্বার্ট স্পেন্সর হিন্দুদিগকে বিশ্বাসঘাতক, চোর, মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন। ইহাই যদি হইল, তবে আমরা খৃস্টানদিগকে কী না বলিতে পারি! আমাদের শাস্ত্রে অনন্ত যন্ত্রণা নাই। যাহাদের অনন্ত নরকে বিশ্বাস করিতে হইয়াছে, না জানি তাহাদের স্বভাব কী পৈশাচিক হইবে! আসল কথা এই বিশ্বাসকে মানুষেরা উপযোগিতার চক্ষে দেখে না। "আবশ্যক হইয়াছে, অতএব, আইস আমরা বিশ্বাস করি' এমন করিয়া যদি লোকে বিশ্বাস করিত, "আবশ্যক চলিয়া গিয়াছে, অতএব আইস আমরা বিশ্বাস করিব না' এমন করিয়া যদি বিশ্বাস পরিত্যাগ

করিত, তাহা হইলে সমস্তই অত্যন্ত সহজ হইয়া যাইত। একবার যাহা বিশ্বাস হয়, সে বিশ্বাস অনেক কাল চলিতে থাকে। একটা দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করি। কোনো রাজ্যে এক জনের দোষে যদি আর-একজনকে শাস্তি দিবার প্রথা থাকে তবে সে প্রথাকে কে না নিন্দা করিবে? ন্যায়পরতার যে ভাব আমাদের হৃদয়ে বর্তমান আছে, তাহার সহিত উক্ত রূপ বিচারের ঐক্য হয় না। কিন্তু মনুষ্যের নিমিত্ত খৃস্টের মৃত্যু ঘটনাকে খৃস্টানেরা কেন ঈশ্বরের ন্যায়পরতার প্রমাণ স্বরূপেই উল্লেখ করেন? তাঁহারা নিজে যাহা করেন না, অন্যকে যাহা করিতে দেখিলে নিন্দা করেন, তাহাকেই ন্যায়পরতা বলিয়া ১৮০০ বৎসর বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন কীরূপে? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুসংস্কারে বিশ্বাস কীরূপে চলিয়া আসে? ইংরাজেরা অনেকে যে বিশ্বাস করেন যে, এক টেবিলে ১৩ জন খাইলে তাহাদের মধ্যে ১ জনের এক বৎসরের মধ্যে মৃত্যু হইবে, অনেকবার হয়তো তাহার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছেন তথাপি তাহা যায় না কেন?

অবশেষে জিজ্ঞাসা করি, গরিব হিন্দুদিগের প্রতি কেন যে নানাবিধ রূঢ় বিশেষণ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহার কি একটা কারণ আছে? কুম্ভীপাক নরকের কথা পড়িয়াই কি স্পেন্সর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, হিন্দুরা বিশ্বাসঘাতক, চোর, মিথ্যাবাদী? না, উহা একটা জানা সত্য, ও বিষয়ে কাহারো দ্বিরুক্তি বা দ্বিমত হইতে পারে না? হিন্দুরা যে বিশ্বাসঘাতক, চোর ও মিথ্যাবাদী সেইটে আগে প্রমাণ করিয়া তার পরে কুম্ভীপাক নরকের কথা তুলিয়া তাঁহার যুক্তি সমর্থন করিলে ঠিক ন্যায়শাস্ত্র অনুযায়ী কাজ হইত।

স্পেন্সর বলিয়াছেন, হিন্দুদের কঠোর নরক আছে, অতএব নিষ্ঠুর দেবতাও আছে। দেবতারা যে নিষ্ঠুর, তাহার প্রমাণ কী? না, তাহাদের ফকিরেরা আত্মপীড়ন করে। যে দেবতারা কষ্ট দেখিয়া সুখী হয়, তাহারা অবশ্য নিষ্ঠুর। প্রথমত, ফকিরেরা হিন্দু নহে। দ্বিতীয়ত, অনেক হিন্দু দেবতার নিকট আত্মপীড়ন করিয়া থাকে বটে (যেমন তারকেশ্বরের নিকট হত্যা দেওয়া ইত্যাদি) কিন্তু তাহা হইতে প্রমাণ হয় না যে, তাহাদের দেবতা নিষ্ঠুর। বরঞ্চ উল্টাটাই সত্য। আমাদের দেশে অনেক ভিক্ষুক আছে, তাহারা হত্যা দিয়া ভিক্ষা আদায় করে। তাহার কারণ এমন নহে যে ভিক্ষাদাতারা কষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত পুলকিত

হইয়া ভিক্ষুককে পুরস্কার দেন। মনুষ্যের পরকষ্ট-অসহিষ্ণুতার প্রতি ভারতবর্ষীয় ভিক্ষুকদের এমন বিশ্বাস আছে যে তাহারা ভিক্ষা করিবার জন্য নিজেকে পীড়ন করে। দেবতার দয়ার প্রতিও হিন্দু উপাসকের তেমনি বিশ্বাস। সে জানে যে, আমি যদি নিজেকে এতখানি কষ্ট দিই, তবে দয়াময় কখনোই সহিতে পারিবেন না, নিশ্চয়ই আসিয়া আমার বাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। যদি আমাদের তপস্বীদিগকে স্পেন্সর ফকির বলিয়া থাকেন তবে সে সম্বন্ধে এই বলিতে পারি যে দেহকে দমন করিয়া আত্মার উন্নতি সাধন করিবার জন্য তপস্বীরা যে ঐহিক সুখ ও আরাম হইতে ইচ্ছাপূর্বক নিজেকে বঞ্চিত করিতেন, পাশ্চাত্য দার্শনিক তাহার মর্ম হয়তো ঠিক বুঝিতে পারিবেন না। এ বিষয়ে স্পেন্সরের ভ্রম বদ্ধমূল। এ ভ্রম কেবলমাত্র যে, এই প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নহে, তাঁহার Data of Ethics নামক গ্রন্থে স্পেন্সর ঠিক এই কথাগুলিই বলিয়াছেন।

ভারতী বৈশাখ, ১২৮৯

৯৯

বৈজ্ঞানিক সংবাদ

আমরা তো জানিতাম, আমাদের দেশেই যত বিশ্বের মশা। শীতের দেশে মশার উৎপাত নাই। সে কথাটা ঠিক নহে। মেরু প্রদেশের আলাস্কা নামক শীতপ্রধান স্থানে মশার যেরূপ প্রাদুর্ভাব তাহা শুনিলে আশ্চর্য হইতে হয়। একজন লিখিয়াছেন– এখানে পশুপক্ষী শিকার করা দায়, ঘন মশার ঝাঁক মেঘের মতো উড়িয়া লক্ষ্য আচ্ছন্ন করে। কখনো কখনো মশায় সেখানকার কুকুর মারিয়া ফেলে। সোয়াট্‌কা সাহেব লিখিতেছেন যে, তিনি শুনিয়াছেন মশায় সেখানকার বৃহৎ ভল্লুককে মারিয়া ফেলিয়াছে। ভল্লুক মশা-সমাচ্ছন্ন জলাপ্রদেশে গিয়া পড়িলে দাঁড়াইয়া দুই পা দিয়া মশার ঝাঁকের সহিত যুদ্ধ করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। মশার গায়ে তাহার বড়ো বড়ো নখের একটি আঁচড়ও পড়ে না, এবং মশাকে জড়াইয়া ধরিবার কোনো সুবিধা হইয়া উঠে না। অবশেষে মশার দংশনে অন্ধ হইয়া ভল্লুক পড়িয়া থাকে, ও না খাইতে পাইয়া মরিয়া যায়। শীতপ্রধান মেরুদেশে মশার যেমন প্রবল প্রতাপ এমন আর কোথাও নহে। জাহাজে করিয়া যাঁহারা মেরুদেশে ভ্রমণ করিতে যান তাঁহারা সকলেই এ কথা জানেন। যেখানে যেখানে জাহাজ থামে

সেইখানেই মশার পাল আসিয়া জাহাজ আক্রমণ করে– জামার আস্তিনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভয়ানক রক্তশোষণ করিতে থাকে। জাহাজ হইতে নামিয়া দুইজন বীরপুরুষ শিকার করিতে গিয়াছিলেন। তাহার একজন জর্মন্ সেনা। ইনি যুদ্ধের সময় অশ্বারোহণে বীরপরাক্রমে ফ্রান্স পর্যটন করিয়াছিলেন, কোনো বিপদ হয় নাই; কিন্তু এখানে মশার উপদ্রবে ঘোড়া হইতে পড়িয়া খোঁড়া হইয়া যান। মশার জ্বালায় ঘোড়া এবং আরোহী এমনই অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন যে আত্মসংযমন উভয়ের পক্ষেই অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সৈন্য জাহাজে আসিয়া গল্প করিলেন– "পেটের মধ্যে মশা যায়, নিশ্বাস টানি নাকে মশা ঢোকে, থু থু করিয়া মুখের মধ্য হইতে মশা ফেলিয়া দিতে হয়।' সে দেশে গ্রীষ্মকালে মশার উপদ্রব বরঞ্চ কিছু কম থাকে, কারণ পাখিরা আসিয়া অনেক মশা খাইয়া ফেলে। আমাদের দেশে এত পাখি আছে, মশাও তো কম নাই।

জলে আগুন জ্বলিতে দেয় না এইরূপ সাধারণের ধারণা, কিন্তু সম্প্রতি বেকর সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, যদি কোনো জিনিস একেবারে শুকাইয়া ফেলা যাইতে পারে, তবে তাহা আর জ্বলে না। সম্পূর্ণ শুষ্ককাঠ জ্বলে না। কিন্তু ইহার পরীক্ষা করা শক্ত। কারণ, চতুর্দিকেই জলীয় পদার্থ আছে। বাতাসের মধ্যে জল আছে। গ্যাসে জল আছে। জলকে দূর করা দায়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, এই জলীয় পদার্থ না থাকিলে অতিশয় দাহ্য পদার্থও জ্বলিতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে, জল জ্বালাইবার সহায়তা করে।

যুদ্ধে বন্দুকের গুলি কত যে বৃথা খরচ হয়, তাহার একটা হিসাব বাহির হইয়াছে। ফরাসি-প্রুশীয় যুদ্ধে দেখা গিয়াছে এক-একটি সৈন্য মারিতে ১৩০০ গুলি খরচ হইয়াছে। সল্‌ফেরিনোর যুদ্ধে প্রত্যেক সৈন্য বধ করিতে ৪২০০ গুলি লাগিয়াছে।

অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন সমুদ্রের ন্যায় ভূপৃষ্ঠও ক্রমাগত তরঙ্গিত বিচলিত হইতেছে; ভূপৃষ্ঠে জোয়ারভাটা খেলিতেছে। কোথাও বা বড়ো ঢেউ কোথাও বা ছোটো ঢেউ উঠিতেছে। পৃথিবীর তরঙ্গসংকুল দেশের মধ্যে জাপান একটি প্রধান স্থান। সেখানে

ছোটো বড়ো ঢেউ ক্রমাগত উত্থিত হইতেছে। আমাদের এখানে এতটা ঢেউ নাই, কিন্তু সম্পূর্ণ যে স্থির আছে তাহা নহে। সমুদ্রে দাঁড় ফেলিলে সমুদ্রের জল যেমন কাঁপিয়া উঠে, রাস্তা দিয়া গাড়ি প্রভৃতি চলিলে ভূতল তেমনি কাঁপিতে থাকে, ইহা সকলেই দেখিয়াছেন। এই ভূ-তরঙ্গ সম্বন্ধে য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা সম্প্রতি পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন।

আহারান্বেষণ ও আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে ছদ্মবেশ ধারণ কীটপতঙ্গের মধ্যে প্রচলিত আছে তাহা বোধ করি অনেকে জানেন। তাহা ছাড়া, ফুল, পত্র প্রভৃতির সহিত স্বাভাবিক আকার-সাদৃশ্য থাকাতেও অনেক পতঙ্গ আত্মরক্ষা ও খাদ্যসংগ্রহের সুবিধা করিয়া থাকে। একটা নীল প্রজাপতি ফুলে ফুলে মধু অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিল। পুষ্পস্তবকের মধ্যে একটি ঈষৎ শুষ্কপ্রায় ফুল দেখা যাইতেছিল, প্রজাপতি যেমন তাহাতে শুঁড় লাগাইয়াছে, অমনি তাহার কাছে ধরা পড়িয়াছে। সে ফুল নহে, সে একটি সাদা মাকড়সা। কিন্তু এমন একরকম করিয়া থাকে যাহাতে তাহাকে সহসা ফুল বলিয়া ভ্রম হয়।

টিকটিকির কাটা লেজ যেমন নড়িতে থাকে, মাকড়সার বিচ্ছিন্ন পাও তেমনি নড়িয়া থাকে। কোনো শত্রু আসিয়া পা ধরিলে মাকড়সা অনায়াসে পায়ের মায়া ত্যাগ করিয়া তাহার পা খসাইয়া ফেলে। দুই-একটা পা গেলেও তাহাদের বড়ো একটা ক্ষতি হয় না– অনায়াসে ছুটিয়া চলে।

বিলাতের উদ্যানকারদের মধ্যে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, যেখানে বিলাতি বেগুনের গাছ রোপণ করা হয় সেখানে পোকামাকড় আসিতে পারে না। যে গাছে পোকা ধরিবার সম্ভাবনা আছে তাহার চারি পাশে বিলাতি বেগুন রোপণ করিয়া গাছকে রক্ষা করা যায়। এটা অনায়াসেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারা যায়।

পণ্ডিতবর টাইলর সাহেব বলেন– পরীক্ষা করিয়া দেখিলে উদ্ভিদদের কার্যেও কতকটা যেন স্বাধীন বুদ্ধির আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। বৃক্ষ নিতান্ত যে জড়যন্ত্রের মতো কাজ করে তাহা নহে, কতকটা যেন বিচার-বিবেচনা করিয়া চলে। টাইলর সাহেব এই

বিষয় লইয়া অনেক বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তিনি বলেন কৃত্রিম বাধা স্থাপন করিলে গাছেরা তাহা নানা উপায়ে অতিক্রম করিবার চেষ্টা করে, এমন-কি, নিজের সুবিধা অনুসারে পল্লব সংস্থানের বন্দোবস্ত পরিবর্তন করিয়া থাকে। এ বিষয়ে তিনি অন্যান্য নানাবিধ প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া সম্প্রতি একটি বক্তৃতা দিয়াছেন।

ত্রিবাঙ্কুরের উপকূলে নারাকাল ও আলেপিতে যে বন্দর আছে, সেখানে সমুদ্র অতিশয় প্রশান্ত। চারি দিকে যখন ঝড় ঝঞ্ঝা উপপ্লব তখনও এ বন্দর দুটির শান্তিভঙ্গ হয় না। ইহার একটি কারণ আছে। ইংরাজিতে প্রাচীনকাল হইতে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, ক্ষুব্ধ সমুদ্রে তেল ঢালিলে তাহা শান্ত হয়। অনেকে তাহা অমূলক মনে করিতেন। কিন্তু সম্প্রতি পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে, বাস্তবিকই তেল ঢালিলে জলের ঢেউ থামিয়া যায়। কিছুদিন হইল একটি প্রস্তাব পাঠ করিয়াছিলাম তাহাতে প্রত্যেক জাহাজে প্রচুর পরিমাণে তৈল রাখিতে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল; ঝড়ের সময় অল্পে অল্পে সেই তৈল জাহাজের দুই পার্শ্বে ঢালিতে হইবে। নারাকাল এবং আলেপি বন্দরের সমুদ্রতল হইতে ক্রমাগত পেট্রোলিয়ম তৈল উত্থিত হইতেছে। কালিফর্নিয়াতীরের নিকটবর্তী একস্থানের সমুদ্রে এইরূপ তৈল-উৎস আছে। সেখানকার সমুদ্রও শান্ত থাকে।

আমেরিকার শিল্পী ও মজুরদের মধ্যেও বহুল পরিমাণে বিদ্যাচর্চা প্রচলিত আছে এইজন্য সেখানকার হাতের কাজ অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। য়ুনাইটেড স্টেট্স্-এ দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার আটশত প্রকাশ্য বিদ্যালয় আছে, অর্থাৎ প্রত্যেক দুইশো লোকের মধ্যে একটি করিয়া বিদ্যালয় আছে। একমাত্র মাসচুসেট্স্ প্রদেশে দুই হাজার পুস্তকালয় আছে, অর্থাৎ প্রত্যেক আটশত লোকের মধ্যে একটি করিয়া পুস্তকালয় আছে। অনেকে মনে করেন বিদ্যাশিক্ষায় শিল্পকাজের ব্যাঘাত করে, কিন্তু তাহা ভ্রম। বিদ্যাশিক্ষায় সকল কাজেরই সহায়তা করে। ফরাসি-প্রুশীয় যুদ্ধে জর্মনদের যে জিত হইল তাহার একটা প্রধান কারণ তাহারা শিক্ষিত– এই নিমিত্ত তাহারা যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করিতে অধিকতর নিপুণতা লাভ করিয়াছিল।

কার্বনিয়ে নামক একজন ফরাসি পণ্ডিত বলেন যে, গঙ্গার নিকটবর্তী জলাশয়ে একপ্রকার অতি ক্ষুদ্র মৎস্য আছে, তাহারা পাখির ন্যায় জলে নীড় প্রস্তুত করে। ইহারা দেখিতে অতি সুন্দর, রামধনুর ন্যায় নানা বর্ণে রঞ্জিত। ইহারা জলের মধ্য হইতে একপ্রকার উদ্ভিদ মুখে করিয়া জলের উপরে রাখে, পুনর্বার তাহা জলমগ্ন না হয় এই উদ্দেশ্যে তাহারা মুখ হইতে বায়ু নির্গত করিয়া জলবুদ্‌বুদের উপর তাহা ভাসাইয়া রাখে। পরদিন সেই গাছের মধ্যে জলবুদ্‌বুদ পুরিয়া দেয় এবং তাহা গোলাকারে পরিণত করে। পুরুষ মৎস্য তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহা পরিষ্কার করিলে পর স্ত্রী মৎস্য ডিম পাড়িতে আহূত হয়। ডিম পাড়িয়া সে তো প্রস্থান করে, পুরুষ মৎস্য সেই ডিম্বের তত্ত্বাবধান করে। এইরূপে দশ দিবস যায়। ডিম ফুটিয়া গেলে সেই নীড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ফুটা করিয়া জলবুদ্‌বুদ কতকটা বাহির করিয়া দেয়। তখন তাহা আর গোলাকার থাকে না, প্রশস্ত হইয়া পড়ে।

আমরা তো গঙ্গার কাছাকাছি থাকি, কিন্তু এ মাছটি যে কী মাছ তাহা তো ঠিক জানি না। গঙ্গাতীরবর্তী পাঠকেরা কি এই মাছের কোনো খবর রাখেন?

বালক আশ্বিন-কার্তিক, ১২৯২

গতি নির্ণয়ের ইন্দ্রিয়

আমাদের কর্ণকুহরের এক অংশে তিনটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি চোঙের মতো আছে তাহার বিশেষ কার্য কী এ পর্যন্ত ভালোরূপ স্থির হয় নাই। পূর্বে শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ অনুমান করিতেন যে ইহার দ্বারা শব্দের দিক নির্ণয় হইয়া থাকে। কিন্তু সম্প্রতি দুই-এক জন পণ্ডিত ইহার অন্যরূপ কার্য স্থির করিয়াছেন।

তাঁহারা বলেন, আমরা কী করিয়া গতি অনুভব করি এ পর্যন্ত তাহার কোনো ইন্দ্রিয়তত্ত্ব জানা যায় নাই। একটা গাড়ি যদি কোনোরূপ ঝাঁকানি না দিয়া সমভাবে সরল পথে চলিয়া যায় তাহা হইলে গাড়ি যে চলিতেছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না– পালের নৌকা ইহার দৃষ্টান্তস্থল। কিন্তু গাড়ি যদি ডাহিনে কিংবা বামে বেঁকে অথবা থামিয়া যায় তবে আমরা তৎক্ষণাৎ জানিতে পারি। পণ্ডিতগণের মতে কর্ণেন্দ্রিয়ের উক্ত অংশই এই গতিপরিবর্তন অনুভব করিবার উপায়। একপ্রকার রোগ আছে যাহাতে রোগী টলমল করিয়া চলে, একপাশে কাত হইয়া পড়ে এবং কানে শুনিতে পায় না। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে সেই অর্ধচন্দ্রাকৃতি কর্ণযন্ত্রের বিকৃতিই তাহাদের রোগের কারণ। কোন্ দিকে কতটা হেলিতেছে ঠিক বুঝিতে না পারিলে কাজেই তাহাদের পক্ষে শক্ত হইয়া চলা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সকলেই জানেন ভূমির উচ্চ-নীচতা মাপিবার জন্য কাঁচের নলের মধ্যে তরল পদার্থ দিয়া একপ্রকার যন্ত্র নির্মিত হয়, আমাদের উক্ত কর্ণপ্রণালীর মধ্যেও সেই প্রকার তরলদ্রব্য আছে, সম্ভবত তাহা আমাদের গতিপরিবর্তন অনুসারে স্থান পরিবর্তন করিয়া আমাদের স্নায়ুকে সচেতন করিয়া দেয় এবং আমরাও তদনুযায়ী তৎক্ষণাৎ আমাদের শরীরের ভার সামঞ্জস্য করিতে প্রবৃত্ত হই।

ইচ্ছামৃত্যু

শরীরের সকল ইন্দ্রিয়ের উপরেই আমাদের ইচ্ছাশক্তির আধিপত্য নাই। পরিপাক রক্তচলাচল প্রভৃতি কার্য আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। আমরা ইচ্ছা করিলে চোখের পাতা বুজিতে পারি কিন্তু কান বুজিতে পারি না। সীল মৎস্য জলে ডুবিবার সময় স্বেচ্ছামতো নাক কান বুজিতে পারে। আমাদের নাসা ও কর্ণ রুদ্ধ করিবার মাংসপেশী আছে কিন্তু তাহারা প্রায় অকমর্ণ্য হইয়া গিয়াছে– দুর্গন্ধ অনুভব করিলে আমরা নাসা কুঞ্চিত করিতে পারি বন্ধ করিতে পারি না। কিন্তু দৈবাৎ এক-এক জন লোক পাওয়া যায় যাহারা জন্তুর ন্যায় অবলীলাক্রমে কান দুলাইতে পারে, মাথার উপরকার চর্ম নাড়াইতে পারে। গোরু জাবর কাটিতে পারে মানুষের পক্ষে তাহা অসাধ্য, কিন্তু অনেক লোক ইচ্ছা-মাত্র অনায়াসে বমন করিতে পারে, দৈবক্রমে পাকস্থলীর মাংসপেশীর উপর তাহাদের কর্তৃত্ব জন্মিয়াছে। সকলেই জানেন আমাদের কতকগুলি স্নায়ু আছে যাহারা আমাদের ইচ্ছার হুকুম তামিল করে। ইচ্ছা হইল হাত তুলিব অমনি স্নায়ুযোগে সেই হুকুম হাতের মাংসপেশীর উপর জারি হইল, হাত উঠিল। কিন্তু পূর্বে বলিয়াছি, শরীরের সর্বত্র এই ইচ্ছাদূতের গতিবিধি নাই; দৈবাৎ শরীরসংস্থানের কোনোরূপ বিপর্যয়বশত এই ইচ্ছা-প্রচারী স্নায়ুর অস্থানে সঞ্চার হইয়া মানুষের অসাধারণ ইন্দ্রিয়ক্ষমতা জন্মিতে পারে। সাধারণত ইচ্ছামাত্র শরীরক্রিয়া নিরোধ করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে। কিন্তু ডাক্তারি শাস্ত্রে তাহার এক আশ্চর্য উদাহরণ লিপিবদ্ধ আছে। কর্নেল টাউনশেন্ড নামক এক ব্যক্তি ইচ্ছা করিলেই মরিতে পারিতেন। প্রথমে ডাক্তাররা তাহা বিশ্বাস করেন নাই। তাঁহারা পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কর্নেল সাহেব চিত হইয়া স্থিরভাবে কিছুক্ষণ শুইয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার নাড়ী কমিয়া হৃৎপিণ্ডের গতিরোধ হইয়া আসিল; অবশেষে জীবনের কোনো লক্ষণ রহিল না। ডাক্তাররা ভয় পাইলেন। কিন্তু আবার আধঘণ্টা পরে ক্রমে তাঁহার নাড়ী ফিরিয়া আসিল, নিশ্বাস-প্রশ্বাস চলিতে আরম্ভ করিল, তিনি কথা কহিতে লাগিলেন। ডাক্তারি শাস্ত্রে বলে, কোনো এক অস্বাভাবিক কারণে হৃৎপিণ্ড ও

ফুসফুসের মাংসপেশীর উপর তাঁহার স্বেচ্ছাস্নায়ুর অধিকার জন্মিয়াছিল। কিন্তু আধঘণ্টাকাল শরীরক্রিয়া রোধ করিয়া কীরূপে প্রাণরক্ষা হয় তাহা কে বলিতে পারে? আমাদের দেশে যোগীদের মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত মাঝে মাঝে পাওয়া গিয়াছে শুনা যায়। কিন্তু যোগী ও রোগীর মধ্যে প্রভেদ এই যে, যোগী সাধনার দ্বারা যে ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন রোগী দেহযন্ত্রের অনিচ্ছাকৃত বিকৃতিক্রমে সেই ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মাকড়সা-সমাজে স্ত্রীজাতির গৌরব

পৌরুষ সম্বন্ধে স্ত্রী-মাকড়সার সহিত পুরুষ-মাকড়সার তুলনাই হয় না। প্রথমত, আয়তনে মাকড়সার অপেক্ষা মাকড়সিকা ঢের বড়ো, তার পর তাহার ক্ষমতাও ঢের বেশি। স্বামীর উপর উপদ্রবের সীমা নাই, তাহাকে মারিয়া কাটিয়া অস্থির করিয়া দেয়। এমন-কি, অনেক সময় তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া খাইয়া ফেলে; এরূপ সম্পূর্ণ দাম্পত্য একীকরণের দৃষ্টান্ত উচ্চশ্রেণীর জীবসমাজে আছে কি না সন্দেহ।

উটপক্ষীর লাথি

নীড় রচনার সময় এই মরুবিহারী বিরাট পক্ষী অত্যন্ত দুর্ধর্ষ হইয়া উঠে। নিকটে মানুষ দেখিলে ছুটিয়া গিয়া আক্রমণ করে, পা দুলাইয়া দুলাইয়া এক প্রচণ্ড লাথি কসাইয়া দেয়। এই এক লাথির চোটে অশ্বের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া গিয়াছে শুনা যায়। এই পাখির আক্রমণ হইতে ছুটিয়া পালানো অসম্ভব। দ্রুতবেগে ইহাকে কেহ হারাইতে পারে না। এরূপ স্থলে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া সহিষ্ণুভাবে ইহার লাথ সহ্য করাই একমাত্র গতি। একজন এইরূপ পাখির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সবলে তাহার গ্রীবা ভূমিতে নত করিয়া ধরিয়াছিল। দৈবক্রমে পাখির লাথি নিজেরই নতমস্তকের উপর পড়িয়া আপনার মস্তিষ্ক বিক্ষিপ্ত করিয়া দিল এবং সেই লোকটি বিনা আঘাতে পরিত্রাণ পাইল।

সাধনা অগ্রহায়ণ, ১২৯৮

জীবনের শক্তি

আমরা ইচ্ছা করি আর নাই করি আমাদের শরীরের ক্রিয়া অবিশ্রাম চলিতেছে; তাহাতে যে কী বিপুল শক্তি ব্যয় হইতেছে তাহা আমরা জানিতে পারি না।

আমাদের হৃৎপিণ্ড চারিটি কোটরে বিভক্ত। তাহার মধ্যে দুইটি কোটরে শরীরের রক্ত আসিয়া প্রবেশ করিতেছে এবং অপর দুইটি অংশ স্যাকরার হাপরের মতো সংকুচিত হইয়া শরীরের সর্বত্র রক্ত প্রবাহিত করিতেছে। দিনরাতি এ কাজের আর বিশ্রাম নাই। এইটুকু চর্মযন্ত্রের পক্ষে কাজও নিতান্ত সামান্য নয়। রক্তসঞ্চারী কোটরদ্বয়ের বাম কোটরটি প্রত্যেক সংকোচনে চার আউন্স রক্ত নয় ফুট দূরে উৎসারিত করে। দক্ষিণ কোটরটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল, কিন্তু তাহাকেও খাটিতে হয়। সুস্থশরীর বয়স্ক লোকের হৃৎপিণ্ড মিনিটে ৭৫/৭৬ বার সংকুচিত হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে রক্তসঞ্চালনক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ড চব্বিশ ঘণ্টায় যে শক্তি ব্যয় করে সেই শক্তিদ্বারা তিন হাজার মণের অধিক (১২০ টন) ভার এক ফুট ঊর্ধ্বে তুলা যাইত।

যেমন হৃৎপিণ্ডের সংকোচন-প্রসারণ অবিশ্রাম চলিতেছে তেমনি নিশ্বাস-প্রশ্বাসেরও বিরাম নাই। তাহাতে করিয়া বক্ষস্থল ক্রমাগত উঠিতেছে পড়িতেছে এবং বুকের পাঁজরা মাংসপেশী এবং ফুসফুস সেই উত্থান-পতনের কার্যে লাগিয়া রহিয়াছে। বিশ্রামকালে চব্বিশ ঘণ্টায় প্রাপ্তবয়স্ক লোকের ফুসফুসের মধ্য দিয়া ছয় লক্ষ ছিয়াশি হাজার বর্গ ইঞ্চি পরিমাণ বায়ু প্রবাহিত হয় এবং পরিশ্রমকালে সেই বায়ুর পরিমাণ পনেরো লক্ষ আটষট্টি হাজার তিনশো নব্বই বর্গ ইঞ্চি পর্যন্ত বাড়িতে পারে। এতটা বায়ু আকর্ষণ ও নিঃসারণ বড়ো সামান্য কাজ নহে। তাহা ছাড়া ফুসফুস এবং বক্ষপ্রাচীর এই বাতাস বাধা দেয় এবং মাংসপেশীর বলে সেই বাধা অতিক্রম করিয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়। চব্বিশ ঘণ্টায় আমাদের শ্বাসসাধক মাংসপেশী যে শক্তি প্রয়োগ করে তাহার দ্বারা ২০০ মণের অধিক ভার (২১ টন) এক ফুট ঊর্ধ্বে তুলা যাইতে পারে।

ইহা ছাড়া মস্তিষ্কের কাজ, পাকযন্ত্রের কাজ এবং অন্যান্য বিবিধ শারীরিক ক্রিয়া বাকি আছে, সে-সমস্ত হিসাব করিয়া দেখিলে দেখা যায় নিরবচ্ছিন্ন আলস্যেও কী প্রচুর শক্তি ব্যয় হইয়া থাকে। আমরা তো কেবল চব্বিশ ঘণ্টার হিসাবের কিঞ্চিদংশ দেখিলাম। একজন মানুষের সমস্ত জীবিতকাল আলোচনা করিলে জীবনের শক্তি যে কী অপরিমেয় তাহা বুঝা যায়।

ভূতের গল্পের প্রামাণিকতা

সার এডমন্ড হর্নবি চীন এবং জাপানের সর্বোচ্চ কন্সুলার কোর্টের প্রধান জজ ছিলেন। তিনি নিজের জীবনের একটি প্রত্যক্ষ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

তিনি মকদ্দমায় যে রায় লিখিতেন সন্ধ্যার সময় খবরের কাগজের সংবাদদাতারা আসিয়া সেই রায় চাহিয়া লইয়া যাইত এবং পরদিনের সংবাদপত্রে প্রকাশ করিত। একদিন এইরূপ রায় লিখিয়া তাঁহার খানসামার কাছে রাখিয়া দিয়াছিলেন; কথা ছিল যখন সংবাদদাতা আসিবে ভৃত্য এই রায় তাহার হস্তে দিবে। জজসাহেব রাত্রে নিদ্রিত আছেন এমন সময় শয়নগৃহের দ্বারে আঘাত শুনিয়া জাগিয়া উঠিলেন। বুঝিলেন কেহ গৃহে প্রবেশের অনুমতির অপেক্ষা করিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে, তিনি প্রবেশ করিবার আদেশ করিলে সেই খবরের কাগজের সংবাদদাতা গম্ভীরভাবে গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার রায় প্রার্থনা করিল। শয়নগৃহে তাহার এরূপ অনধিকার প্রবেশে ক্রোধ প্রকাশ করিয়া হর্নবি তাহাকে খানসামার নিকট হইতে রায় চাহিয়া লইতে আদেশ করিলেন, কিন্তু তথাপি সে পুনঃ পুনঃ পূর্বমতো প্রার্থনা করিতে লাগিল। কতক বা তাহার অনুনয়ে বিচলিত হইয়া কতক বা নিজপত্নী লেডি হর্নবির জাগরণ আশঙ্কায় তিনি আর কিছু না করিয়া সংক্ষেপে তাঁহার লিখিত রায়ের মর্ম মুখে মুখে বলিয়া গেলেন, সে তাহা লিখিয়া লইল এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া চলিয়া গেল। তখন রাত্রি দেড়টা। অনতিবিলম্বে লেডি হর্নবি জাগ্রত হইলে তাঁহার স্বামী তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা বলিলেন। পরদিন জজসাহেব আদালতে গেলে সংবাদ পাইলেন যে, সেই সংবাদদাতা পূর্বরাত্রে একটা হইতে দেড়টার মধ্যে প্রাণত্যাগ করিয়াছে এবং সে রাত্রে সে গৃহত্যাগ করে নাই। ইন্‌কোয়েস্ট পরীক্ষায় হৃদ্‌রোগই তাহার মৃত্যুর কারণ বলিয়া স্থির হইয়াছে।

এই গল্পটি যখন নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরি পত্রিকায় প্রকাশিত হইল তখন সাধারণের মনে অত্যন্ত বিস্ময় উদ্রেক করিল। বিশেষত হর্নবি সাহেব একটি বড়ো আদালতের বড়ো জজ–

প্রমাণের সত্য-মিথ্যা সূক্ষ্মভাবে অবধারণ করাই তাঁহার কাজ। এবং তিনি নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তিনি পুরুষানুক্রমে আইনব্যবসায়ী, কল্পনাশক্তিপরিশূন্য এবং অলৌকিক ঘটনার প্রতি বিশ্বাসবিহীন।

এই ঘটনা কাগজে প্রকাশ হইবার চারি মাস পরে "নর্থ চায়না হেরাল্ডে'-র সম্পাদক ব্যাল্‌ফোর সাহেব নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরিতে নিম্নলিখিতমতো প্রতিবাদ করেন।

১। হর্নবি সাহেব বলেন, বর্ণিত ঘটনাকালে লেডি হর্নবি তাঁহার সহিত একত্রে ছিলেন। কিন্তু সে সময়ে লেডি হর্নবি নামক কোনো ব্যক্তিই ছিলেন না। কারণ হর্নবি সাহেবের প্রথম স্ত্রী উক্ত ঘটনার দুই বৎসর পূর্বে গত হন এবং ঘটনার চারি মাস পরে তিনি দ্বিতীয় স্ত্রীকে বিবাহ করেন।

২। হর্নবি সাহেব ইন্‌কোয়েস্টের দ্বারা মৃতদেহ পরীক্ষার উল্লেখ করেন, কিন্তু স্বয়ং পরীক্ষক "করোনার' সাহেবের নিকট সন্ধান লইয়া জানিলাম, উক্ত মৃতদেহ সম্বন্ধে ইনকোয়েস্ট বসে নাই।

৩। হর্নবি সাহেব ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি তাঁহার রায় প্রকাশের দিন বলিয়া নির্দেশ করেন। কিন্তু আদালতের গেজেটে সে দিনে কোনো রায় প্রকাশিত হয় নাই।

৪। হর্নবি বলেন, সংবাদদাতা রাত্রি একটার সময় মরে। এ কথা অসত্য। প্রাতঃকালে ৮/৯ ঘটিকার সময় তাহার প্রাণত্যাগ হয়।

ব্যাল্‌ফোর সাহেবের এই প্রতিবাদের বিরুদ্ধে সার হর্নবি কিছু বলিতে পারিলেন না, সব কথা এক প্রকার মানিয়া লইতে হইল।

ইহার পর অলৌকিক ঘটনার প্রামাণ্য সাক্ষ্য সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।

মানব শরীর

যাঁহারা সাধনায় প্রকাশিত 'প্রাণ ও প্রাণী' প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা পূর্বেই আভাস পাইয়াছেন যে, প্রাণীশরীর অণুপরিমাণ জীবকোষের সমষ্টি। এ কথা ভালো করিয়া পর্যালোচনা করিলে বিস্ময়ের উদ্রেক হয়।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন, আমাদের শরীরের যে যে অংশে জীবনের প্রবাহ আছে সমস্তই প্রটোপ্ল্যাজ্‌ম নামক পঙ্কবৎ পদার্থে নির্মিত। কেবল মানবশরীর নহে উদ্ভিদ প্রভৃতি যে-কোনো জীবিত পদার্থ আছে প্রটোপ্ল্যাজ্‌ম ব্যতীত আর কোনো পদার্থেই জীবনীশক্তি নাই।

মানবশরীর অণুবীক্ষণযোগে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, এই প্রটোপ্ল্যাজ্‌ম অতি ক্ষুদ্র কোষ আকারে বদ্ধ হইয়া সর্বদা কার্য করিতেছে। কোথাও কোথাও তন্তু আকার ধারণ করিয়া আমাদের মাংসপেশী ও স্নায়ু রচনা করিয়াছে। কিন্তু পূর্বোক্ত কোষগুলিই আমাদের শরীরের জীবনপূর্ণ কর্মশীল উপাদান।

কণামাত্র প্রটোপ্ল্যাজ্‌ম নামক প্রাণপদার্থ সূক্ষ্ম আবরণে বদ্ধ হইয়া এক-একটি কোষ নির্মাণ করে। প্রত্যেক প্রাণকোষের কেন্দ্রস্থলে একটি করিয়া ঘনীভূত বিন্দু আছে। এই কোষগুলি এত ক্ষুদ্র যে, তাহার ধারণা করা অসম্ভব।

এই কোষগুলিই আমাদের শরীরের কর্মকর্তা, আমাদের প্রাণরাজ্যের প্রজা। ইহারাই আমাদের অস্থি নির্মাণ করিতেছে, শরীরের আবর্জনা বাহির করিয়া দিতেছে, মাংসপেশীরূপে পরিণত হইতেছে। স্নায়ুকোষগুলি শরীরের রাজস্থানীয়। তাহারাই শরীরের রাজ্যরক্ষা আইনজারি প্রভৃতি বড়ো বড়ো কাজে নিযুক্ত।

ইহাদের মধ্যে কার্যের ভাগ আছে, পাকযন্ত্রের পাচক রস নিঃসারণ হইতে অস্থি নির্মাণ পর্যন্ত সমস্ত কাজ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দলের উপর বিলি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। একদল অন্যদলের কার্যে তিলমাত্র হস্তক্ষেপ করে না। তাহাদের অধিকাংশ কার্যই প্রায়

স্বাধীনভাবে নির্বাহিত হয়। যদিও তাহারা মস্তিষ্ক ও স্নায়ুকে কর্তৃপক্ষীয় বলিয়া স্বীকার করে।

আমাদের শরীরের কাজ যে কত অসংখ্য এবং কোষের দল সেই-সমস্ত কাজ কত শৃঙ্খলাপূর্বক নির্বাহ করিতেছে তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। কেহ বা জিহ্বাতলে লালা জোগাইতেছে, কেহ বা বাষ্প সৃজন করিয়া চক্ষুতারকাকে সরস করিয়া রাখিতেছে, কেহ বা পাকস্থলীতে রস নির্মাণ করিতেছে—আরও কতক সহস্র কাজ আছে। যকৃৎ যে-সকল জীব-কোষে নির্মিত তাহারা কেবল যকৃতেরই সহস্র কাজ করিয়া থাকে, আর কিছুই করে না, প্রত্যেক প্রত্যঙ্গবর্তী কোষের এইরূপ কার্যনিয়ম। মস্তিষ্ক যে-সকল কোষে নির্মিত তাহারা শরীরের সর্বোচ্চ মণ্ডপে বসিয়া অবিশ্রাম রাজকার্যে নিযুক্ত।

অতএব মানবশরীরটা একটা সমাজের মতো। অসংখ্য প্রজার ঐক্যসমষ্টি। একটা সৈন্যের দল যেমন অশ্বারোহী পদাতি প্রভৃতি নানা অংশে বিভক্ত। এবং প্রত্যেক অংশে নানা লোকের সমষ্টি অথচ সকলে মিলিয়া একটা বৃহৎ প্রাণীর মতো অতিশয় সংহত ঐক্য রক্ষা করিয়া চলে; কতকগুলি মরিতেছে আবার নূতন লোক আসিয়া তাহার স্থান পূরণ করিতেছে—মানবের জীবিত শরীর অবিকল সেইভাবে কাজ করিতেছে। আমরা প্রত্যেকেই একা এক সহস্র, এমন-কি তাহার চেয়ে ঢের বেশি।

রোগশত্রু ও দেহরক্ষক সৈন্য

জল যেমন মৎস্যে, স্থল যেমন জীবজন্তুতে, বায়ু তেমনি অসংখ্য জীবাণু-বীজে পরিপূর্ণ এ কথা আজকালকার দিনে নূতন নহে। সকলেই জানেন গুড় এবং মধুতে যে গাঁজ উৎপন্ন হয়, জিনিসপত্রে ছাতা পড়ে, মৃতদেহ পচিয়া যায়, এই জীবাণুই তাহার কারণ। এই জীবাণুবীজ উপযুক্ত ক্ষেত্রে পড়িলে অবিলম্বে পরিণতি লাভ করিয়া বংশ বৃদ্ধি করিতে থাকে। ইহারা যে কত ক্ষুদ্র ভালো করিয়া তাহা ধারণা করা অসম্ভব। কোনো লেখক বলেন, এক বর্গ ইঞ্চি স্থানে এক থাক করিয়া সাজাইলে তাহাতে ব্যাক্টিরিয়া নামক জীবাণু লন্ডনের জনসংখ্যার একশত গুণ ধরানো যাইতে পারে।

বিখ্যাত ফরাসিস্ পণ্ডিত প্যাস্টর্ এই জীবাণুকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। একদলের নাম দিয়াছেন এরোবি, অন্য দলের নাম অ্যানেরোবি। এরোবিগণ মৃতদেহের উপরিভাগে জন্মলাভ করিয়া তাহাকে পচাইয়া অল্পে অল্পে জ্বালাইয়া ধ্বংস করিয়া ফেলে, এবং অ্যানেরোবিগণ গলিত পদার্থের নিম্নভাগে উৎপন্ন হইয়া তাহার ক্ষয় সাধন করিতে থাকে; বিশুদ্ধ বায়ুর অক্সিজেন-বাষ্প লাগিলেই তাহারা মরিয়া যায় এবং উপরিতলস্থ এরোবিগণ তাহাদিগকে নষ্ট করিয়া ফেলে। এইরূপে দুইদলে মিলিয়া পৃথিবীর সমস্ত মৃত পদার্থ অপসৃত করিতে থাকে। ইহারা না থাকিলে মৃত্যু অমর হইয়া থাকিত এবং অবিকৃত মৃতদেহস্তূপে ধরাতলে পা ফেলিবার স্থান থাকিত না। পৃথিবীর যে অংশে এই জীবাণুদের গতিবিধি নাই সেখানে জীবজন্তু উদ্ভিদ কিছুই নাই। সেখানে হয় বালুকাময় মরুভূমি নয় অনন্ত তুষারক্ষেত্র। সেখানে মৃতদেহ কিছুতেই পচিতে চায় না; শকুনি গৃধিনী ও দৈবাগত কোনো মাংসাদ জীবের সাহায্য ব্যতীত সেখানকার মৃতদেহ অপসারণের অন্য কোনো উপায় নাই।

ফ্রান্সে যখন একসময়ে গুটিপোকার মধ্যে একপ্রকার মড়ক উপস্থিত হইয়া রেশমের চাষের বড়োই ব্যাঘাত করিতে লাগিল তখন বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়া প্যাস্টর অন্য কর্ম ফেলিয়া সেই গুটিপোকার রোগতথ্য অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। প্যাস্টর ডাক্তার নহেন,

জীবতত্ত্ববিৎ নহেন, রসায়নশাস্ত্রেই তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি—মদ কী করি গাঁজিয়া বিকৃত হইয়া উঠে সেই অনুসন্ধানেই তিনি অধিকাংশ সময়ক্ষেপ করিয়াছেন, সহসা গুটিপোকার রোগ নির্ণয় করিতে বসা তাঁহার পক্ষে একপ্রকার অনধিকারচর্চা বলিয়া মনে হইতে পারে। এবং প্যাস্টরও এই কার্যভার গ্রহণ করিতে প্রথমে কিছু ইতস্তত করিয়াছিলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, অণুবীক্ষণের সাহায্যে কিছুদিন সন্ধান করিতে করিতে পণ্ডিতবর দেখিতে পাইলেন, জীবাণুতে যেমন মদ গাঁজিয়া উঠে, জীবাণুই তেমনি গুটিপোকার রোগের কারণ। মদের রোগ ও প্রাণীর রোগের মধ্যে ঐক্য বাহির হইয়া পড়িল, এবং পূর্বে তিনি যে সন্ধানে প্রবৃত্ত ছিলেন এখানেও তাহার অনুবৃত্তি ধরিতে পারিলেন। অবশেষে এই সূত্র অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, জীবশরীরের অনেক রোগ এই জীবাণুদের দ্বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে। ইহারা অনুক্ষণ শনি ও কলির ন্যায় শরীরে প্রবেশ করিবার ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছে; স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই ইহারা সেই অবসরে দেহ আশ্রয় করিয়া বসে এবং শরীরের রসকে বিকৃত করিতে থাকে।

বাহিরে যখন আমাদের এক অদৃশ্য শত্রু অন্তরে অবশ্য তাহার কতকটা প্রতিবিধান আছে সন্দেহ নাই। সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে শত্রুও যেমন, আমাদের অন্তর্বর্তী রক্ষকও সেইরূপ। কুকুরের অনুরূপ মুগুর। দুইই নিরতিশয় ক্ষুদ্র। ডাক্তার উইলসন সাহেব তৎসম্বন্ধে যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন আমরা তাহারই কতক কতক সংকলন করিয়া দিলাম।

ভালো অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিতে গেলে রক্তকণা জলের মতো বর্ণহীন দেখায়। তাহার কারণ এই, আসলে, বর্ণহীন রসের উপর অসংখ্য লোহিত কণা ভাসিতেছে; খালি চোখে সেই লোহিত বর্ণের কণাগুলিই আমাদের নিকটে রক্তকে লাল বলিয়া প্রতিভাত করে—অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত সেই বর্ণহীন রস আমরা দেখিতে পাই না। রক্তের এই লোহিত কণাগুলির বিশেষ কাজ আছে।

আমরা নিশ্বাসের সহিত যে বায়ু গ্রহণ করি ওই লোহিত কণাগুলি তাহার মধ্য হইতে অক্সিজেন সংগ্রহ করিয়া লয় এবং শরীরের কার্বনিক অ্যাসিড বাষ্প নামক বিষবায়ু ফুসফুসের নিকট বহন করিয়া আনে এবং আমরা তাহা প্রশ্বাসের সহিত নিষ্ক্রান্ত করিয়া দিই।

রক্তস্থ শ্বেতকণার কার্য অন্যরূপ। তাহারা প্রত্যেকে অতিশয় ক্ষুদ্র জীবনবিশিষ্ট কোষ। ইহাদের আয়তন এক ইঞ্চির পঁচিশ শত ভাগের একভাগ। গতসংখ্যক সাধনায় 'প্রাণ ও প্রাণী' প্রবন্ধে প্রটোপ্ল্যাজ্‌ম নামক সর্বাপেক্ষা আদিম প্রাণীপিণ্ডের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে; রক্তের এই শ্বেতকণাগুলি সেই প্রটোপ্ল্যাজ্‌ম কোষ। আমাদের শরীরে বাস করে বটে তথাপি ইহারা স্বাধীন জীব। এই লক্ষ লক্ষ প্রাণীপ্রবাহ আমাদের শরীরে যথেচ্ছ চলাফেরা করিয়া বেড়ায়; ইহাদের গতিবিধির উপরে আমাদের কোনো হাত নাই। ইহারা অনেক সময় যেন যদৃচ্ছাক্রমে রক্তবহ নাড়ি ভেদ করিয়া আমাদের শরীরতন্তুর মধ্যে প্রবেশ করে, এবং দেহের নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে বাহির হয়।

অণুবীক্ষণযোগে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যায় অ্যামিবা প্রভৃতি জীবাণুদের ন্যায় ইহারা অনুক্ষণ আকার পরিবর্তন করিতে থাকে। এবং ইহাও দেখা গিয়াছে খাদ্যকণা পাইলে ইহারা তাহাকে আক্রমণ করিয়া রীতিমতো পরিপাক করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই আহারের ক্ষমতা দেখিয়াই পণ্ডিতগণ ইহার নাম 'ফ্যাগোসাইট' অর্থাৎ ভক্ষককোষ রাখিয়াছেন। ইহার অপর নাম 'লিউকোসাইট' বা শ্বেতকোষ।

ইহারা যে কীরূপ আহারপটু তাহার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। সকলেই জানেন ব্যাঙাচি ব্যাঙ হইয়া দাঁড়াইলে তাহার ল্যাজ অন্তর্হিত হইয়া যায়। আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, ব্যাঙাচির রক্তবহ নাড়ি ত্যাগ করিয়া বিস্তর শ্বেতকোষ দলে দলে তাহার ল্যাজটুকু অধিকার করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সেখানকার স্নায়ু এবং মাংসপেশী ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতেছে। শরীরের অধিবাসীরা এমনতরো মনঃসংযোগপূর্বক লাগিলে তুচ্ছ পুচ্ছটুকু আর কতক্ষণ টিকিতে পারে। বয়ঃপ্রাপ্তি হইলে ব্যাঙাচির কান্‌কা লোপ পায় সেও এইরূপ কারণে।

কেবল যে শরীরের অনাবশ্যক ভার মোচন ইহাদের কাজ তাহা নহে। রোগস্বরূপে বাহিরের যে-সকল জীবাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করে ইহারা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া রীতিমতো হাতাহাতি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। বাহিরের আক্রমণকারীগণ যদি যুদ্ধে জয়ী হয় তবে আমরা জ্বর প্রভৃতি বিবিধ ব্যাধি দ্বারা অভিভূত হই, আর যদি আমাদের শরীরের রক্ষক-সৈন্যদল জয়ী হয় তবে আমরা রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাই।

স্মরণ হইতেছে, অন্যত্র কোনো প্রবন্ধে পাঠ করিয়াছি কেবল রোগ কেন, পীড়াজনক যে-কোনো পদার্থ আমাদের শরীরে নিবিষ্ট হয় এই সর্বভুকগণ তাহাকে আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিতে চেষ্টা পায়। চোখে একটুকরা বালি পড়িলে সেটাকে লোপ করিবার জন্য ইহারা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসে—চক্ষু সেই সংগ্রামচিহ্নে রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। শরীরে কিছু বিদ্ধ হইলে এই সৈন্যকণিকাগুলি ভিড় করিয়া আসিয়া সে স্থান লাল করিয়া তোলে। ক্ষতস্থানের পুঁজ পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, ব্যাধিবীজগুলিকে ইহারা চারি দিক হইতে আক্রমণ করিয়া খাইবার চেষ্টা করিতেছে।

শরীরের সবল অবস্থায় বোধ করি এই শ্বেতকোষগুলি স্বভাবত তেজস্বী থাকে এবং ব্যাধিবীজকে সহজে পরাহত করিতে পারে। অনাহার অতিশ্রম অজীর্ণ প্রভৃতি কারণে শরীরের দুর্বল অবস্থায় যখন ইহারা হীনতেজ থাকে তখন ম্যালেরিয়া ওলাউঠা প্রভৃতি ব্যাধিবীজগণ অকস্মাৎ আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করে।

যাহা হউক, বায়ুবিহারী জীববীজাণুগণ ব্যাধিশস্য উৎপাদনের জন্য সর্বদা উপযুক্ত ক্ষেত্র অনুসন্ধান করিতেছে এই কথা স্মরণ করিয়া আহার, পানীয় ও বাসস্থান পরিষ্কার রাখা আমাদের নিজের ও প্রতিবেশীদের হিতের পক্ষে কত অত্যাবশ্যক তাহা কাহারো অবিদিত থাকিবে না।

উদয়াস্তের চন্দ্রসূর্য

উদয়াস্তের সময় দিক্‌সীমান্তে চন্দ্রসূর্যকে কেন বড়ো দেখিতে হয় ইহাই লইয়া প্রথম বৎসরের সাধনায় কিঞ্চিৎ আলোচনা চলে। সাধনার কোনো পাঠক লিখিয়া পাঠান, বায়ুর রিফ্রাক্‌শন্‌ বশতই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। তৎসম্বন্ধে প্রক্টর ও র্যা নিয়ার্ড সাহেবের রচিত 'ওল্‌ড্‌ অ্যাণ্ড্‌ নিয়ু অ্যাস্‌ট্রনমি' নামক গ্রন্থে যাহা কথিত হইয়াছে আমরা তাহার সার সংকলন করিয়া দিলাম।

প্রক্টর সাহেব দেখাইয়াছেন, বায়ুর রিফ্রাক্‌শন্‌ বশত সূর্যের দৃশ্যমান পরিধি লম্বভাবে কমিয়া যায় অথচ পার্শ্বের দিকে বাড়ে না। এমন-কি, চন্দ্রের পরিধি লম্বভাগে এবং পার্শ্বভাগে উভয়তই কমিয়া যায়।

কী কী কারণবশত এরূপ ঘটে তাহার বিস্তারিত বিবরণ অনেক পাঠকের নিকট জটিল ও বিরক্তিজনক হইবে জানিয়া আমরা বিবৃত করিতে ক্ষান্ত হইলাম। ইচ্ছা করিলে পাঠকগণ আমাদের বর্তমান অবলম্বনীয় গ্রনেথর ২৪৭ পৃষ্ঠা পাঠ করিলে সমস্ত জানিতে পারিবেন।

যাহা হউক, বায়ুর রিফ্র্যাক্‌শনে চন্দ্রসূর্যমণ্ডল ছোটো দেখিতে হয়—তবে তাহাদিগকে বড়ো বলিয়া ভ্রম হয় কেন?

প্রক্টর সাহেব বলেন, আকাশ আমাদের চক্ষে একটি গোলাকার মণ্ডপস্বরূপ দেখা দেয়। আমাদের মাথার উপরে এই মণ্ডপ যতটা দূর মনে হয়, নিম্নে দিগন্তের দিকে ইহার সীমা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি দূরবর্তী বলিয়া বোধ হয়। তাহার কারণ, সাধারণত আকাশের উচ্চতা পরিমাপের সামগ্রী বড়ো বেশি নাই, কিন্তু যখন দেখি, বাড়ি ঘর, লোকালয়, শস্যক্ষেত নদী অরণ্য পর্বত অতিক্রম করিয়াও আকাশ দিগন্তে মিশিয়াছে

তখন সেই দিকে তাহার দূরত্ব নির্দেশ করিবার অনেকগুলি পদার্থ পাওয়া যায়। এইরূপে চিরাভ্যাসক্রমে অজ্ঞানত দিগন্তবর্তী আকাশকে ঊর্ধ্বাকাশের অপেক্ষা আমরা অনেক দূরস্থ বলিয়া মনে করি।

অতএব চন্দ্রসূর্যকে যখন উদয়াস্তকালে দিগন্তসংলগ্ন দেখি তখন উক্ত সংস্কারবশত তাহাকে অপেক্ষাকৃত বহুদূরবর্তী বলিয়া জ্ঞান হয়; এইজন্য, চক্ষে তাহার পরিধি যতটা দেখা যায় মনে মনে তদপেক্ষা তাহাকে বড়ো করিয়া লই।

ইহার অনুকূলে একটি পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ আছে। সাদা কাগজে খুব বড়ো একটি কালো অক্ষর আঁকিয়া তাহার প্রতি অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকো। অবশেষে চাহিয়া চাহিয়া চক্ষু যখন পরিশ্রান্ত হইয়া যাইবে, তখন অক্ষর হইতে চোখ তুলিয়া লইয়া যদি সেই কাগজের সাদা অংশে দৃষ্টিপাত কর, তবে সেখানেও সেই অক্ষরের অনুরূপ একটা সাদা অক্ষর দেখিতে পাইবে। কারণ, বহুক্ষণ চাহিয়া থাকায় চক্ষুতারকায় উক্ত অক্ষর মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই অক্ষরের দিকে দীর্ঘকাল চাহিয়া যদি সহসা দূরের দেয়ালের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ কর, তবে অতিশয় বৃহদাকারের একটা অক্ষর দেখিতে পাইবে। অথচ প্রকৃতপক্ষে কাগজে লিখিত অক্ষরের অপেক্ষা তাহা কখনোই বৃহৎ নহে, কারণ, ঠিক সেই অক্ষরটিই চক্ষুরতারকায় অঙ্কিত হইয়াছে। কিন্তু দেয়ালের দূরত্বের সহিত গুণ করিয়া লইয়া আমরা চিরসংস্কার অনুসারে তাহাকে মনে মনে বাড়াইয়া লই।

অনেক সময় কুয়াশার ভিতর দিয়া চন্দ্রসূর্যকে ওই একই কারণে, তাহার যথার্থ দৃশ্যমান, আয়তনের অপেক্ষা বড়ো বলিয়া মনে হয়। কারণ, দূরের জিনিস ঝাপ্‌সা হয়, এইজন্য, ঝাপসা জিনিসকে বেশি দূরের বলিয়া ভ্রম হয়। যত বেশি দূর মনে হইবে, আয়তনও তদনুসারে বৃহত্তর বলিয়া প্রতিভাত হইবে। লেখক বলেন, অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কুয়াশার ভিতর দিয়া একটা জাহাজ বিসদৃশ বৃহৎ দেখায়, কিন্তু উপযুক্ত যন্ত্রের দ্বারা তুলনা করিয়া পরিমাপ করিলে দেখা যায়, কুয়াশামুক্ত অবস্থার সহিত তাহার আয়তনের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই।

যথারীতি পরিমাপের দ্বারা দিগন্তবিলম্বী চন্দ্র মধ্যাকাশগত চন্দ্রের অপেক্ষা কিছুমাত্র বড়ো প্রমাণ হয় নাই।

অভ্যাসজনিত পরিবর্তন

অভ্যাসের দ্বারা আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিবর্তন সাধিত হইতে পারে। হলধারী চাষা এবং লেখনীধারী ভদ্রলোকের হাতের অনেক প্রভেদ। কৃত্রিম উপায়ে চীনরমণীর পা কীরূপ ক্ষুদ্র ও বিকৃত হইয়া যায় তাহা সকলেই অবগত আছেন।

কিন্তু এইরূপ অভ্যাস ও কৃত্রিমকারণজনিত পরিবর্তনসকল পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত হয় কি না ইহা লইয়া আজকাল বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে আলোচনা চলিতেছে।

হার্বার্ট স্পেন্সর বলেন, হয় যে, এ কথা না মানিলে অভিব্যক্তিবাদ অসম্পূর্ণ থাকে। কিন্তু জর্মান পণ্ডিত বাইস্‌মান্‌ বহুল যুক্তি, দৃষ্টান্ত ও পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, অভ্যাসজনিত নূতনসাধিত অঙ্গবৈচিত্র্য সন্ততিপরম্পরায় সঞ্চারিত হয় না। বিখ্যাত অভিব্যক্তিবাদী ওয়ালেস্‌ সাহেবও বাইস্‌মানের পক্ষ সমর্থন করেন।

তিনি বলেন, ভালো জাতের যুবক ঘোড়া অথবা কুকুর যদি কোনো কারণে পঙ্গু অথবা অঙ্গহীন হইয়া পড়ে, তবে পশুব্যবসায়ীরা তাহাকে সন্তান উৎপাদনের জন্য স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়া দেয়। এবং তাহার সন্ততিবর্গ তাহার পূর্বপুরুষদের অপেক্ষা কোনো অংশে হীন হয় না।

সাধারণের মধ্যেও একটা সংস্কার আছে যে, তন্তুবায় প্রভৃতি শিল্পীশ্রেণীদের মধ্যে পূর্বপুরুষদিগের অভ্যাসপ্রসূত বিশেষ কার্যনৈপুণ্য উত্তরবংশীয়েরা বিনা শিক্ষাতেও প্রাপ্ত হয়। ওয়ালেস্‌ বলেন ইহা ভ্রম। কারণ, যদি ইহা সত্য হইত তবে পিতার অধিক বয়সের সন্তান অধিকতর স্বাভাবিক নিপুণতা লাভ করিত। তাহা হইলে কনিষ্ঠ ছেলেরাই শ্রেষ্ঠ হইত। কিন্তু তৎপক্ষে কোনো প্রমাণ নাই। প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির সন্তানেরা প্রতিভাসম্পন্ন হয় না, বরং তাহার বিপরীত হয় এরূপ দৃষ্টান্তই অধিক পাওয়া যায়। তাহা যদি না হইত

তবে জগতে শিল্পনৈপুণ্য ও প্রতিভা উত্তরোত্তর বংশানুক্রমে অত্যন্ত বিকাশ লাভ করিয়াই চলিত।

কিন্তু কোনো কোনো লেখক বলেন যে, বিশেষ শ্রেণীর জন্তুদের মধ্যে যে বিশেষ নূতন প্রত্যঙ্গের উদ্ভব দেখা যায় তাহা বহুকালের ক্রমশ অভ্যাসজনিত না মনে করিলে অন্য কারণ পাওয়া যায় না। যেমন শৃঙ্গ। যে-সমস্ত জন্তু মাথা দিয়া ঢুঁ মারিত তাহাদেরই কপালের চামড়া পুরু হইয়াছিল এবং হাড় ঠেলিয়া উঠিয়াছিল; সেই পরিবর্তন সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া অভ্যাসে বৃদ্ধি পাইয়া বিচিত্রাকার শৃঙ্গে পরিণত হইয়াছে।

ওয়ালেস্ বলেন এ কথার কোনো প্রমাণ নাই। ডারুয়িনের গ্রন্থে দেখা যায় কোনো কোনো দেশে ঘোড়ার কপালে ক্ষুদ্র শৃঙ্গের মতো উচ্চতা দেখা গিয়াছে। কিন্তু ঘোড়ার প্রাচীন বংশের মধ্যে কোনো জাতেরই শিং দেখা যায় নাই। যদি শিং থাকিত তবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মানুসারে এমন একটা আত্মরক্ষার অস্ত্র বিলুপ্ত না হইবারই সম্ভাবনা ছিল। অতএব এই ঘোড়ার ছোটো শিং নূতন উদ্ভব।

শজারুর কাঁটা, পাখির পালক এ-সমস্ত যে, বিশেষ অভ্যাসের দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে এমন বলা যায় না।

পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে আমাদের শরীরের সর্বাংশে স্পর্শশক্তি সমান নহে। আমাদের পিঠের মাঝখানে যে জিনিস অনুভব করিতে পারি না, আমাদের আঙুলের ডগায় তাহা অনায়াসে অনুভূত হয়। হার্বার্ট স্পেন্সর বলেন ইহার কারণ, প্রধানত অঙ্গুলি দ্বারা আমরা সকল দ্রব্য স্পর্শ করিয়া দেখি বলিয়া অভ্যাসে তাহার স্পর্শশক্তি বাড়িয়া উঠিয়াছে এবং সেই শক্তি বংশানুক্রমে চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু পৃষ্ঠে তাহার বিপরীত।

ওয়ালেস্ বলেন প্রাকৃতিক নির্বাচন ইহার কারণ। স্পর্শশক্তির উপরে আমাদের জীবনরক্ষা অনেকটা নির্ভর করিতেছে। শরীরের যে যে স্থানে আঘাত লাগিলে জীবনের

অধিক ক্ষতি করে সেই সেই স্থানে স্পর্শশক্তি সেই পরিমাণে অধিক। চক্ষুর স্পর্শশক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক, অথচ এ কথা কেহ বলিতে পারে না যে, চক্ষু দ্বারা দ্রব্যাদি স্পর্শ করা আমাদের সর্বাপেক্ষা অভ্যস্ত। কিন্তু চক্ষু গেলে জীবনধারণ করা দুরূহ; অতএব যেসেকল প্রাণীর চক্ষু অত্যন্ত স্পর্শক্ষম, চক্ষে তিলমাত্র আঘাত লাগিলেই জানিতে পারে ও চক্ষুরক্ষার জন্য তৎক্ষণাৎ সচেষ্ট হইতে পারে তাহারাই প্রাকৃতিক নির্বাচনে টিঁকিয়া যায়। এরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেখানো হইয়াছে।

অতএব ওয়ালেসের মতে অভিব্যক্তির অভ্যাসের কোনো কার্যকারিতা নাই। প্রাকৃতিক নির্বাচনই তাহার প্রধান অঙ্গ। অর্থাৎ, যে সন্তানগণ কোনো কারণে অন্যদের অপেক্ষা একটা অতিরিক্ত সুবিধা লইয়া জন্মগ্রহণ করে তাহারাই জীবনযুদ্ধে জয়ী হইয়া টিকিয়া যায়, অন্যেরা তাহাদের সহিত পারিয়া উঠে না, সুতরাং মারা পড়ে। এইরূপে এই নূতন সুবিধা ও তৎসম্পন্ন জীব স্থায়ী হয়। শৃঙ্গহীন হরিণদের মধ্যে যদি নিগূঢ় কারণে একটা শৃঙ্গী হরিণ জন্মগ্রহণ করে তবে তাহার শিংয়ের জোরে সেই বেশি আহার এবং মনোমতো হরিণী সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইবে। এবং তাহার বংশে যতই শৃঙ্গী হরিণের জন্ম হইবে ততই শৃঙ্গহীন হরিণের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িবে।

অতএব বর্তমান অনেক অভিব্যক্তিবাদীদের মতে সহজাত সুবিধাগুলি জীবরাজ্যে স্থায়ী হয়, অভ্যাসজাত সুবিধাগুলি নহে।

ওলাউঠার বিস্তার

ভারতবর্ষ যে ওলাউঠা রোগের জন্মভূমি, এ সম্বন্ধে সন্দেহ অতি অল্পই আছে। ১৮১৭ খৃস্টাব্দে এই ভীষণ মড়ক বঙ্গদেশ হইতে দিগ্‌বিজয় করিতে বাহির হইয়া সিন্ধু, য়ুফ্রাটিস, নীল, দানিয়ুব, ভল্‌গা, অবশেষে আমেরিকার সেন্টলরেন্স এবং মিসিসিপি নদী পার হইয়া দেশবিদেশে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত করিয়াছিল।

কিন্তু এই রোগ জল, খাদ্য অথবা বায়ু কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া ভ্রমণ করে এখনও তাহা নিঃসংশয়রূপে স্থির হয় নাই। তবে, জলটাই তাহার সর্বাপেক্ষা প্রধান বাহন তাহার অনেকগুলা প্রমাণ পাওয়া যায়। মে মাসের নিয়ু রিভিয়ু পত্রে এ সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

১৮৪৯ খৃস্টাব্দে লন্ডনে যখন এই মড়কের প্রাদুর্ভাব হয় তখন সেখানে সাধারণত টেম্‌স্ নদীর জল ব্যবহার হইত। শহরের নর্দমা এই নদীতে গিয়া মিশিত। সেই সময় দেখা গিয়াছে, নদীর জল শহরের যত নীচে হইতে লওয়া হইয়াছে মৃত্যুসংখ্যা ততই বাড়িয়াছে, এবং শহরের সংস্রবে অপেক্ষাকৃত অল্পদূষিত অংশের জল যাহারা ব্যবহার করিয়াছে তাহাদের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যাও তত অল্প হইয়াছে।

১৮৫৪ খৃস্টাব্দে লন্ডনে যে ওলাউঠার মড়ক হয় তখনও এ সম্বন্ধে একটি প্রমাণ পাওয়া গেছে। লন্ডনে যে দুই জলের কলওয়ালা জল জোগাইয়া থাকে তন্মধ্যে সাউথ্‌ওয়াক্র্ ওয়াটার কোম্পানি ব্যাটার্সি নামক স্থানের পয়ঃপ্রণালীর নিকটবর্তী টেম্‌স্ হইতে জল লইত। এবং ল্যাম্বেথ্ ওয়াটার কোম্পানি নদীর অনেক উপর হইতে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ জল আহরণ করিত। লন্ডনের স্থানে স্থানে এই দুই কম্পানির পাইপ সংলগ্নভাবে দুই পাশাপাশি বাড়িতে ব্যবহৃত হইয়াছে অথচ মৃত্যুসংখ্যা তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে সাউথ্‌ওয়াক্র্ কোম্পানির জল যাহারা ব্যবহার করিয়াছে তাহাদের মধ্যে হাজার করা সাতান্ন জন মরিয়াছে আর ল্যাম্বেথ্ কোম্পানির জল যাহারা পান করিত তাহাদের মধ্যে হাজার করা এগারো জনের মৃত্যু হয়।

১৮৫৪ খৃস্টাব্দে ইংলন্ডে সোহোপল্লীর গোল্‌ডন্‌ স্কোয়ার নামক একটি ক্ষুদ্র অংশে ওলাউঠা দেখা দেয়। তাহার কারণ নির্ণয়ের জন্য যে কমিশন বসে তাঁহারা দেখিলেন সেখানে পল্লীর লোক একটি বিশেষ কূপের জল পান করিয়া থাকে। এবং সন্ধানের দ্বারা জানিলেন, মড়কের প্রাদুর্ভাবের প্রাক্‌কালে স্থানীয় একটি নল-কূপ কীরূপে জীর্ণ হইয়া যায় এবং মৃত্তিকাতল দিয়া আবর্জনাপ্রবাহ এই জলের সহিত মিশ্রিত হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যেখানে এই জলাশয় অবস্থিত সেই রাস্তার উপরেই একটি মদ চোঁয়াইবার কারখানা ছিল, সেখানকার কর্মচারীরা উক্ত জল পান করিত না এবং তাহাদের মধ্যে একজনেরও ওলাউঠা হয় নাই।

১৮৮৫ খৃস্টাব্দে ডোরান্ডা নামক একটি কুলিজাহাজ ইংলন্ড ছাড়িয়া মাসখানেক পরে জাভাদ্বীপের বন্দরে কয়লা তুলিয়াছিল। সেখানে কোনো মাল বোঝাই হয় নাই, কেবল ফার্স্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জারদের জন্য ফল এবং শাকসবজি লওয়া হয়। সমস্ত পথ ডিস্টিল্‌-করা জল ব্যবহার হইয়াছে এবং কোনো বন্দর হইতে জল লওয়া হয় নাই। বন্দর ছাড়ার পর জাহাজে ওলাউঠা দেখা দিল। কিন্তু প্রথমশ্রেণীর প্যাসেঞ্জারদের কেহ রোগগ্রস্ত হয় নাই। তাহারাই ফল ও উদ্ভিজ্জ খাইয়াছিল এবং বন্দরে নামিয়া রাত্রিযাপন করিয়া আসিয়াছিল। জাহাজের ডেক্‌ সাফ করিবার জন্য তীর হইতে কিয়ৎ পরিমাণে বালুকা আনা হইয়াছিল। সেই বালুকা জাহাজের কোনো কোনো বিভাগে দুই দিন ব্যবহার করিয়া দুর্গন্ধবোধে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, জাহাজের লোকের বিশ্বাস সেই বালুকার মধ্যেই ওলাউঠার বীজ ছিল। যদি তাহাই সত্য হয় তবে এ স্থলে জলের দোষ দেওয়া যায় না। বালুকা হইতে বিষ নিশ্বাসযোগে শরীরে গৃহীত হইয়াছে এইরূপ অনুমান করিতে হয়।

'ইংলন্ড' নামক স্টীমার ১৮৬৬ খৃস্টাব্দে লিভারপুল হইতে যাত্রা করিয়া হ্যালিফ্যাক্সে পৌঁছায়। পথের মধ্যে ওলাউঠায় তিনশো লোক মরে। বন্দরে আসিলে পাইলট উক্ত জাহাজের সহিত নৌকা বাঁধিয়া তাহাকে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দেয়। ওই পাইলট এবং তাহার দুই জন সঙ্গী জাহাজে পদার্পণমাত্র করে নাই। দুই দিন পরেই ওই পাইলট ওলাউঠায় আক্রান্ত হয় এবং তৃতীয় দিনে তাহার একটি সঙ্গীকেও ওলাউঠায় ধরে। তখন

সে অঞ্চলে আর কোথাও ওলাউঠা ছিল না। এখানেও বায়ু ব্যতীত আর কিছুকে দায়ী করা যায় না।

১৮৮৪ খৃস্টাব্দে কক্ সাহেব, ওলাউঠাকে শরীরের উপরে জীবাণুবিশেষের ক্রিয়া বলিয়া সাব্যস্ত করেন। যদিও এ মত এখনো সম্পূর্ণ সর্ববাদীসম্মত হয় নাই তথাপি অধিকাংশের এই বিশ্বাস।

অনেক জীবাণুবীজ বহুকাল শুষ্ক অবস্থায় থাকিয়া অনুকূল আধার পাইলে পুনরায় বাঁচিয়া উঠে। কিন্তু কক্ সাহেবের ওলাউঠা-জীবাণুগণকে এ পর্যন্ত বীজ সৃজন করিতে দেখা যায় নাই এবং একবার শুষ্ক হইয়া গেলে তাহারা মরিয়া যায়। এ কথা যদি সত্য হয় তবে ধুলা প্রভৃতি শুষ্ক আধার অবলম্বন করিয়া সজীব ওলাউঠা-জীবাণু বায়ুযোগে চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইতে পারে না। জলপথই তাহার, প্রশস্ত পথ এবং ওলাউঠা-জীবাণু জলজ।

ঈথর

ঈথর স্পর্শের অতীত, এবং পদার্থের গতিকে কিছুমাত্র বাধা দেয় না, এ সম্বন্ধে বিস্তর পরীক্ষা করা হইয়াছে। এইজন্য বোধ হয়, অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি ঈথরের অস্তিত্বকে কাল্পনিক অনুমান মনে করেন। কিন্তু ঈথর আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগম্য নহে, আলোকবোধ ও উত্তাপবোধই তাহার প্রমাণ।

কথাটা সংক্ষেপে এই—পৃথিবীতে প্রধানত সূর্য হইতে আলোক ও উত্তাপ বিকীর্ণ হইতেছে। এই পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানকার আকাশে যদি কোনো জানিত বস্তু থাকে, সে অতি সূক্ষ্ম গ্যাস; কোথাও বা পরমাণু আকারে, কোথাও বা খানিকটা সমষ্টিবদ্ধভাবে; কিন্তু ইহাদের পরস্পরের মধ্যে দীর্ঘ ব্যবধান। এই বিচ্ছিন্ন পদার্থগুলি আলোকবহনকার্যে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। বিশেষত আলোক যে গতি অবলম্বন করিয়া আসে, কোনো কঠিন, তরল অথবা বাষ্পীয় পদার্থ সে গতি চালনা করিতে পারে না। অতএব তাহার একটা স্বতন্ত্র বাহন আছে সন্দেহ নাই। বাহন আছে তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই, কারণ, কিরণমাত্রই যে তরঙ্গবৎ কম্পমান এবং তাহার গতির সময় সুনির্দিষ্ট ইহা সম্পূর্ণ প্রমাণ হইয়া গেছে।

ক্রিয়া শূন্য আশ্রয় করিয়া হইতে পারে না ইহাও বিজ্ঞানের একটি অকাট্য সিদ্ধান্ত। বস্তু আপন সংলগ্ন পদার্থের উপরেই কাজ করে। শক্তি অবিচ্ছিন্ন মধ্যস্থ পদার্থ অবলম্বন করিয়াই একস্থান হইতে অন্যস্থানে সঞ্চরণ করিতে পারে। পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে যে কেবল কিরণের সম্বন্ধ তাহা নহে, একটা আকর্ষণের যোগ আছে। আকর্ষণটি বড়ো কম নহে; যে টান পড়ে তাহা সতেরো ফুট চওড়া ১০০০০০০০০০০০০টা ইস্পাতের রজ্জুও সহিতে পারে না। এত বড়ো একটা প্রবল শক্তিকে কে চালনা করিতেছে? একটা ইস্পাতের পাতকে বিস্তর বলপ্রয়োগ করিয়াও বিচ্ছিন্ন করা কঠিন; অথচ এ কথা সকলেরই জানা আছে যে, বস্তুমাত্রেরই পরমাণু গায়ে গায়ে সংলগ্ন নহে; পরস্পরের মধ্যে ফাঁক আছে এবং সেই ফাঁকে ঈথর নামক বিশ্বব্যাপী যোজক পদার্থ অবস্থিতি করিয়া

অসংলগ্ন পরমাণুপুঞ্জকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। এই মধ্যস্থ জিনিসটি স্পর্শাতীত বটে, কিন্তু তাহার এমন গুণ আছে যে, প্রবলতম আকর্ষণ সঞ্চার করিতে পারে।

এই ঈথরের কম্পন কেবল যে আমরা আলোক ও উত্তাপবোধের দ্বারা অনুভব করি তাহা নহে। যে-সকল বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের দ্বারা তড়িৎপ্রবাহ সম্বন্ধে আমরা জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি, সেগুলাও যেন সেই বিশ্বব্যাপী ঈথরের নাড়ীর বেগ অনুমান করিবার যন্ত্র। এখনো এই আলোক এই তড়িতের গতি ও শক্তিতত্ত্ব নির্ণয় হয় নাই; এখনো ইহার ক্রিয়াকলাপ যন্ত্রতত্ত্বের ধারণার বাহিরে। বর্তমান শতাব্দীতে ইহাদের সম্বন্ধে বিস্তর তথ্য জানা গিয়াছে। অনেক পণ্ডিত আশা করিয়া আছেন ভাবী শতাব্দীতে ইহার একটা তত্ত্বনির্ণয় হইবে এবং সেই তত্ত্বের উপর সমস্ত পদার্থবিদ্যার একটা নূতন ভিত্তি স্থাপিত হইবে। জীবনীশক্তি এবং মানসশক্তি এখনো বিজ্ঞানের হস্তে ধরা দেয় নাই, কিন্তু বিখ্যাত পদার্থতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক অলিভার লজ সাহেব অনুমান করিতেছেন ঈথরের সঙ্গে সঙ্গেই সে দুটো ধরা পড়িবে, পরস্পরের মধ্যে বোধ করি বা কোনো একটা নিগূঢ় যোগ আছে।

ভূগর্ভস্থ জল এবং বায়ুপ্রবাহ

বৃষ্টির জল ভূতলে আসিয়া পড়িলে তাহার কিয়দংশ মাটিতে শুষিয়া লয়, কিয়দংশ বাতাসে উবিয়া যায় এবং অবশিষ্ট অংশ জলস্রোত এবং নদী-আকারে ভূমিতল হইতে গড়াইয়া পড়ে।

মাটি যদি তেমন কঠিন হয় তবে অনেকটা জল উপরে থাকিয়া গিয়া বিল, জলা প্রভৃতির সৃষ্টি করে।

যে জল মাটির মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে বর্তমান প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

এই মৃত্তিকা-শোষিত জলের কিছু অংশ ঘাস এবং গাছের শিকড় টানিয়া লয় এবং সেই রস পাতার মধ্য দিয়া বাষ্প আকারে উবিয়া যায়। কিন্তু বেশির ভাগ জল ছিদ্র এবং ফাটলের মধ্য দিয়া নিম্নস্তরে সঞ্চিত হয় এবং স্তর যদি ঢালু হয় তবে সেই ভূমধ্যস্থ জলও তদনুসারে গড়াইয়া পড়িতে থাকে।

মৃত্তিকাস্তর ছিদ্রবহুল হইলে উপরিস্থ জলস্রোত কীরূপ অন্তর্ধান করে তাহা ফল্গু প্রভৃতি অন্তঃসলিলা নদীর দৃষ্টান্তে বুঝিতে পারা যায়।

পৃথিবীর উপরকার জল ক্রমে মাটির ভিতরে কত নীচে পর্যন্ত চুঁইয়া পড়ে এবং কেন বা একস্থানে আসিয়া বাধা পায় এখনও তাহার ভালোরূপ তথ্য নির্ণয় হয় নাই। কিন্তু ইহা দেখা গিয়াছে যে, ভূতলের নিম্নস্তরে কিছুদূর নামিয়া আসিলেই একটি সম্পূর্ণ জলসিক্তস্থানে আসিয়া পৌঁছানো যায়, সেখানে মৃত্তিকার প্রত্যেক ছিদ্র বায়ুর পরিবর্তে কেবলমাত্র জলে পরিপূর্ণ।

যেমন সমুদ্রের জল সর্বত্রই সমতল তেমনি মাটির নীচের জলেরও একটা সমতলতা আছে। কোনো বিশেষ প্রদেশের ভূগর্ভস্থ জলের তলোচ্চতা কী, তাহা সে দেশের কূপের জলতল দেখিলেই বুঝা যাইতে পারে।

এই জল অবিশ্রাম মন্দগতিতে সমুদ্র অথবা নিকটবর্তী জলাশয়ের দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে, এবং ঋতুবিশেষে এই জলতল কখনো উপরে উঠে কখনো নীচে নামিয়া যায়।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে মাটির প্রকৃতি অনুসারে এই ভূগর্ভস্থ জলতলের উচ্চতা পরিমিত হয়। জলা জায়গায় হয়তো কয়েক ফুট নীচেই এই জলতল পাওয়া যায়, আবার কোনো কোনো জায়গায় বহুশত ফুট নিম্নে এই জলতল দৃষ্টিগোচর হয়। যে প্রদেশে ভূতলের যত নিম্নে জলধারণযোগ্য অভেদ্য মৃত্তিকাস্তর আছে সে প্রদেশে ভূগর্ভস্থ জলতল সেই পরিমাণে নির্দিষ্ট হয়।

এই ভূগর্ভস্থ সর্বব্যাপী জলপ্রবাহ মানুষের পক্ষে নিতান্ত সামান্য নহে। কূপ সরোবর উৎস প্রভৃতি আশ্রয় করিয়া এই জলই পৃথিবীর অধিকাংশ মানবের তৃষ্ণা নিবারণ করে– এবং স্বাস্থ্যরক্ষার সহিতও ইহার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ঋতুবিশেষে এই ভূগর্ভস্থ জলের তলোচ্চতা উঠিয়া-নামিয়া থাকে। এবং এই উঠা-নাবার সহিত রোগবিশেষের হ্রাস-বৃদ্ধির যোগ আছে। পেটেন্‌কোফার সাহেব বলেন, জলতল যত উপরে উঠে টাইফয়েড জ্বর ততই বিস্তার লাভ করে। তাঁহার মতে, ভূমির আর্দ্রতা রোগবীজপালনের সহায়তা করে বলিয়াই এরূপ ঘটে।

কোনো কোনো পণ্ডিত অন্য কারণ নির্দেশ করেন। তাঁহারা বলেন, ভূগর্ভস্থ জল ভূতলের অনতিনিম্নে পর্যন্ত যখন উঠে তখন পৃথিবীর অনেক আবর্জনার সহিত সহজে মিশ্রিত হইতে পারে।

কীরূপে মিশ্রিত হয় তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা স্পষ্ট হইবে। পল্লীগ্রামে যেখানে শহরের মতো পয়ঃপ্রণালীর পাকা বন্দোবস্ত নাই সেখানে অনেক স্থলে কুণ্ডের মধ্যে মলিন পদার্থ সঞ্চিত হইতে থাকে- যখন উপরে উঠে তখন মলমিশ্রিত মৃত্তিকার সহিত জলের সংযোগ হইতে থাকে এবং সেই জল রোগবীজ ও দূষিত পদার্থসকল বহন করিয়া কূপ ও সরোবরকে কলুষিত করিয়া ফেলে।

ইহা হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন, পানীয় জল বিশুদ্ধ রাখিতে হইলে বিস্তর সতর্কতার আবশ্যক। কাপড় কাচিয়া স্নান করিয়া জলাশয়ের জল মলিন করিতে না দিলেও অদূরবর্তী আবর্জনা প্রভৃতির মলিনতা জলমধ্যে সঞ্চারিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে।

এই মলিনতা অনেক সময় দূরের জলাশয়কে স্পর্শ করে অথচ নিকটের জলাশয়কে অব্যাহতি দেয় এমন দেখা গিয়াছে। তাহার একটি কারণ আছে। পূর্বে বলা হইয়াছে ভূগর্ভস্থ জল সমুদ্র অথবা অন্য কোনো নিকটবর্তী জলাশয়ের অভিমুখে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতে থাকে। আবর্জনাকুণ্ডের উজানে যে কূপ প্রভৃতি থাকে তাহা নিকটবর্তী হইলেও, মলিন পদার্থ স্রোতের প্রতিকূলে সে জলাশয়ে গমন করিতে পারে না, কিন্তু অনুকূল স্রোতে দূষিত পদার্থ অনেক দূরেও উপনীত হইতে পারে। ভূগর্ভস্থ জলপ্রবাহের অভিমুখ-গতি কোন্ দিকে তাহা স্থির হইলে জলাশয়ের জলদোষ নিবারণ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

কূপ হইতে অধিক পরিমাণে জল তুলিয়া লওয়া হইলে সেই শূন্যপ্রায় কূপ চতুর্দিক হইতে বলসহকারে জল আকর্ষণ করিতে থাকে। তখন উপর হইতে নিম্ন হইতে দূর-দূরান্তর হইতে জলধারা আকৃষ্ট হওয়াতে সেইসঙ্গে অনেক দূষিত পদার্থ সঞ্চারিত হইতে

পারে। অছিদ্র জমির অপেক্ষা সছিদ্র বালুময় জমিতে এইরূপ আকর্ষণের সম্ভাবনা অনেক অধিক। ওলাউঠা প্রভৃতি সংক্রামক রোগের বীজ এইরূপ উপায়ে বালু-জমিতে অতি শীঘ্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

ভূতলের নিম্নে যেমন জলপ্রবাহ আছে, তেমনি বায়ুপ্রবাহও আছে। এঁটেল মাটিতে এই বায়ুপ্রবাহ কিছু কম এবং সছিদ্র আল্‌গা মাটিতে কিছু বেশি।

আকাশে প্রবাহিত বায়ুস্রোতে যে পরিমাণে কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস আছে ভূগর্ভস্থ বায়ুস্রোতে তদপেক্ষা অনেক বেশি থাকিবার কথা। কারণ, মাটির সহিত নানা প্রকার জান্তব এবং উদ্ভিজ্জ পদার্থ মিশ্রিত থাকে, সেই-সকল পদার্থজাত কার্বনের সহিত বাতাসের অক্সিজেন মিশ্রিত হইয়া কার্বনিক অ্যাসিডের উৎপত্তি হয়; ইহা ছাড়া মাটির নীচেকার অনেক পচা জিনিস হইতেও কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাসের উদ্ভব হইয়া থাকে।

মাটির আর্দ্রতা এবং উত্তাপ অনুসারেও এই কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাসের পরিমাণ বাড়িতে থাকে। ম্যুনিক্‌ শহরে পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে আষাঢ়-শ্রাবণে ভূগর্ভস্থ বায়ুর কার্বনিক অ্যাসিডের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বাড়িয়া ওঠে, এবং মাঘ-ফাল্গুনে সর্বাপেক্ষা কমিয়া যায়।

সাধারণত ইহাও দেখা গিয়াছে যে, আল্‌গা ভাঙা মাটিতে কার্বনিক অ্যাসিড অল্প এবং যে শক্ত মাটিতে সহজে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না তাহাতে কার্বনিক অ্যাসিডের পরিমাণ অধিক। চষা জমি অপেক্ষা পতিত জমিতে কার্বনিক অ্যাসিড চতুর্গুণ অধিক। ইহার কারণ, যে মাটির মধ্যে বায়ু বদ্ধ হইয়া থাকে তাহাতে কার্বনিক অ্যাসিড অধিক সঞ্চিত হয়।

ভূগর্ভস্থ জলের ন্যায় ভূগর্ভস্থ বায়ুরও একটা স্রোত আছে তাহা পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়া গেছে। এই বায়ুচলাচলের উপর আমাদের স্বাস্থ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি অনেকটা নির্ভর করে।

কারণ, দেখা গিয়াছে এই বায়ুতে বহুল পরিমাণে কার্বনিক অ্যাসিড এবং অন্যান্য দূষিত গ্যাস আছে। তাহা ছাড়া, মাটির ভিতরকার রোগ-বীজ এই বায়ুপ্রবাহ অবলম্বন করিয়া চতুর্দিকে সঞ্চারিত হইতে পারে।

নানা কারণে ভূগর্ভস্থ বায়ুর প্রবাহ রক্ষিত হইয়া থাকে। ভূতলের উপরিস্থ বায়ু-চলাচল তাহার একটা কারণ।

আরও কারণ আছে। বহুকাল অনাবৃষ্টির পরে যখন মুষলধারে বৃষ্টি পতিত হয় তখন সেই বৃষ্টিজল ভূগর্ভস্থ বায়ুকে ঠেলিয়া অনেকটা নীচের দিকে লইয়া যায় এবং সিক্তভূমি হইতে তাড়িত হইয়া শুষ্কভূমি দিয়া বায়ুপ্রবাহ উপরে উঠিতে থাকে। যে বাড়ির মেজে ভালো করিয়া বাঁধানো নহে বর্ষার সময় ভূগর্ভবায়ু সেই মেজে দিয়া বাহির হইবার সুবিধা পায়। কোনো কোনো স্থলে ডাক্তারেরা দেখিয়াছেন বহুকাল অনাবৃষ্টি-অন্তে বৃষ্টিপতনের পর সহসা নিউমোনিয়া কাশের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তাহার একটি কারণ এইরূপ অনুমান করা যায় যে, বৃষ্টিতাড়িত ভূগর্ভবায়ু রোগ-বীজ সঙ্গে লইয়া নানা শুষ্ক স্থান দিয়া উপরে উঠিত থাকে।

পূর্বে বলিয়াছি, পেটেন্‌কোফারের মতে, যখন ভূগর্ভস্থ জলতল উপরে উঠিতে থাকে তখন সেই জলসংযোগে কোনো কোনো রোগের বৃদ্ধি হয়। রোগ-বীজের উপর জলের ক্রিয়াই যে তাহার একমাত্র কারণ তাহা নহে। জলতল যত উপরে উঠে ভূগর্ভের বায়ুকেও সে তত ঠেলিয়া তুলিতে থাকে– এবং সেই বায়ুর সঙ্গে অনেক দূষিত বাষ্প এবং রোগ-বীজ উঠিয়া পড়ে।

ভূগর্ভে বায়ু-চলাচলের আর-একটি বৃহৎ কারণ আছে। তাহা আকাশ-বায়ু এবং ভূগর্ভ-বায়ুর উত্তাপের অসাম্য। তাহার বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক।

মাটি নানা প্রকৃতির আছে এবং সকল মাটি সমান সহজে উত্তপ্ত হয় না। কিন্তু জল সকল মাটি অপেক্ষাই বিলম্বে উত্তাপ গ্রহণ করে।

যে জিনিস সহজে উত্তাপ গ্রহণ করে সে জিনিস সহজে উত্তাপ ত্যাগও করে। এই কারণে, জল মাটি অপেক্ষা বিলম্বে উত্তপ্ত হয় এবং উত্তাপ ছাড়িতেও বিলম্ব করে। ভিজা স্যাঁতসেঁতে মাটি রৌদ্রোত্তাপ সহজে গ্রহণ করে না। তেমনি, সহজে ত্যাগও করে না, শুষ্ক বেলে মাটি শীঘ্রই গরম হইয়া উঠে আবার শীঘ্রই জুড়াইয়া যায়।

ভূমির উত্তাপের ফল কেবল যে ভূমিতেই পর্যবসান হয় তাহা নহে। আকাশের বায়ুতাপের প্রতিও তাহার প্রভাব আছে। সাধারণত উক্ত হয় যে, শুষ্ক বায়ু বিকিরিত উত্তাপকে সহজে পথ ছাড়িয়া দেয় এবং ভিজা বায়ু সেই উত্তাপ বহুল পরিমাণে শোষণ করিয়া লয়। সম্পূর্ণ শুষ্ক বাতাস প্রকৃতির কোথাও দেখা যায় না, এইজন্য সকল বায়ুই সূর্যোত্তাপ এবং পৃথিবী হইতে বিকিরিত উত্তাপের দ্বারা উত্তপ্ত হয়। পরীক্ষা দ্বারা যতদূর দেখা গিয়াছে তাহাতে বোধ হয় বাতাসের তাপ অব্যবহিত সূর্যতাপের অপেক্ষা ভূমির তাপের দ্বারাই অধিক পরিমাণে নিয়মিত হয়। তপ্ত ভূমির সংস্পর্শে প্রথমত বায়ুর নিম্নতন স্তর উত্তপ্ত হইয়া বিস্তার লাভ করে এবং উপরে উঠিয়া যায়, উপরের অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ু নীচে নামিয়া ভূমির তাপ গ্রহণ করে, এমনি করিয়া সমস্ত বায়ু গরম হইয়া উঠে। সকলেই জানেন, বহু উচ্চ আকাশের বায়ু পৃথিবীর নিকটবর্তী বায়ুর অপেক্ষা অনেক পরিমাণে শীতল।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে মাটির তাপ এবং বাতাসের তাপ সমান নহে। এবং সাধারণত মাটির তাপই অধিক।

মাটি ভালো তাপ-পরিচালক নহে, এইজন্য মাটির উপরিতলের উত্তাপ নিম্নতলে পৌঁছিতে বিলম্ব হয়। এই কারণেই গ্রীষ্মকালে ভূতল যখন উষ্ণ হইয়া উঠে তখন নিম্নস্তর অপেক্ষাকৃত শীতল থাকে এবং শীতকালে যখন ভূতলের তাপ হ্রাস হয় তখন সেই শৈত্য

নিম্নস্তরে পৌঁছিতে বিলম্ব হয়; এইজন্য শীতকালে ভূমির উপরিতলের মাটির অপেক্ষা নিম্নতলের মাটি বেশি গরম থাকে। চাণক্য-শ্লোকে আছে যে, কূপোদক শীতকালে উষ্ণ এবং গ্রীষ্মকালে শীতল হইয়া থাকে। পূর্বলিখিত নিয়মানুসারে ইহার কারণ নির্ণয় কঠিন নহে।

গ্রীষ্মকালে ভূতল ভূগর্ভ হইতে অধিকতর উত্তপ্ত হওয়াতে ভূমির উপরিস্তরবর্তী বায়ু নিম্নস্তরের অভিমুখে প্রবেশ করিতে থাকে এবং শীতকালে তাহার বিপরীত ঘটিয়া থাকে। ঘর যদি অগ্নির উত্তাপে অত্যন্ত গরম করা যায় এবং মেজে যদি উপযুক্তরূপ বাঁধানো না থাকে তবে স্থানীয় ভূগর্ভস্থ গ্যাস সেই গৃহে ভাসমান হইয়া উঠিতে থাকে ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

অল্পকাল হইল ডবলিন শহরের রাস্তা পাথরে বাঁধানো হইয়াছে। তাহার পর হইতে সেখানে টাইফয়েড জ্বরের প্রাদুর্ভাব অনেক বাড়িয়াছে। তাহার কারণ, ভূগর্ভবায়ু এখন রাজপথে বাহির হইতে পায় না, কাঁচা মেজের ভিতর দিয়া বাহির হইতে থাকে। এইরূপে গৃহমধ্যে দূষিত বাষ্পের সঞ্চার হয়।

এমনও দেখা গিয়াছে খুব শীতের সময় যখন পথঘাটে বরফ জমিয়া যায়, তখন রাজপথের নিম্নবর্তী গ্যাস-পাইপের পলাতক গ্যাস রাস্তা দিয়া বাহির হইবার স্থান না পাইয়া ঘরের ভিতরে বাহির হইতে থাকে এবং এইরূপে বিষাক্ত বায়ু গ্রহণে অনেকে সংকটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইয়াছে।

যাহা হউক, এই প্রবন্ধ হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন ভূগর্ভস্থ জল এবং বায়ুর উপর আমাদের স্বাস্থ্য বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। যাহাতে জলাশয়ের নিকটবর্তী কোনো স্থানে দূষিত পদার্থ না জমিতে পারে সেজন্য সতর্ক হওয়া উচিত। এবং ঘরের মেজে ও বাড়ির চারি দিকে কিছুদূর পর্যন্ত ভালো করিয়া বাঁধাইয়া দিয়া ভূগর্ভস্থ দূষিত বাষ্পমিশ্রিত বায়ুর পথ রোধ করা বিশেষ আবশ্যক।

সাধনা আশ্বিন-কার্তিক, ১৩০১